একাদশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি

BIOTECHNOLOGY

প্রধান শব্দসমূহ : টিস্যু কালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, প্লাসমিড, ইনসুলিন, জিনোম সিকোয়েন্সিং

নতুন শিক্ষাক্রমে মাধমিক শ্রেণিতে জীবপ্রযুক্তি, টিস্যুকালচার, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বাস্তবক্ষেত্রে এসব প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমরা সংক্ষিপ্তভাবে জেনেছ। এ অধ্যায়ে উক্ত বিষয়গুলো সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. টিস্যুকালচার প্রযুক্তির ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
২. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ধাপসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. জিন ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৪. বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫. জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৬. জীব প্রযুক্তির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৭. জীব প্রযুক্তির বিকাশের সাথে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।

জীবপ্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি আধুনিক ও প্রয়োগমুখী শাখা। বায়োটেকনোলজি (জীবপ্রযুক্তি) শব্দটি আজ থেকে বহু পূর্বে ১৯১৯ সালে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন হাঙ্গেরীয় কৃষি প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky)। Biology এবং Technology শব্দ দু'টির সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে Biotechnology নামক বিশেষ অর্থবোধক শব্দটি।

বর্তমান বিশ্বউন্নয়ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। বলা হয়ে থাকে এটা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যে দেশ যতটা উন্নত সে দেশ অর্থনীতি, যোগাযোগ ও শক্তিতে ততটা উন্নত। কিন্তু সব প্রযুক্তিই জীবপ্রযুক্তি নয়। মাটি দিয়ে ইট তৈরিও একটি প্রযুক্তি, মাটির গভীর থেকে তেল, গ্যাস উঠানোও প্রযুক্তিনির্ভর, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারাবিশ্বে মুহূর্তেই যোগাযোগ স্থাপন, মোবাইল ফোনের নানাবিধ ব্যবহার ইত্যাদি সবই প্রযুক্তিনির্ভর। কিন্তু এগুলো জীবপ্রযুক্তি নয়।

উত্তম ব্যাকটেরিয়া প্রকরণ নির্বাচন করে উত্তম গুণমানের দই তৈরি করা একটি সহজ জীবপ্রযুক্তি। অ্যালকোহল তৈরিও এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। এগুলো প্রাচীনতম জীবপ্রযুক্তি। ব্যাকটেরিয়াকে ব্যবহার করে পচনশীল জৈববস্তু থেকে বায়োগ্যাস তৈরি এক ধরনের জীবপ্রযুক্তি। গবেষণাগারে ছোট একখণ্ড ভাজক টিস্যু থেকে হাজার হাজার চারা তৈরি করার প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি। ১৯৭০ দশকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি তথা জিন-প্রকৌশল উদ্ভাবিত হওয়ার পর জীবপ্রযুক্তি বিষয়টি নতুনমাত্রা লাভ করেছে।

জীবপ্রযুক্তির পরিধি (Scope of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির পরিধি ব্যাখ্যা করার জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়।

(i) ব্লু বায়োটেকনোলজি (Blue Biotechnology) : এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির জলীয় ও সামুদ্রিক প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(ii) গ্রিন বায়োটেকনোলজি (Green Biotechnolog): এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

(iii) রেড ও হোয়াইট বায়োটেকনোলজি (Red & White Biotechnolog): এর দ্বারা বায়োটেকনোলজির চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রয়োগ বর্ণনা করা হয়।

Scanned by CamScanner

জীবপ্রযুক্তি কী?

কোলম্যান (১৯৬৮) এর মতে, জীবন্ত উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা এদের অংশবিশেষ ব্যবহার করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারোপযোগী উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নতুন উদ্ভিদ, প্রাণী, অণুজীব বা দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি হলো জীবপ্রযুক্তি।

জীবপ্রযুক্তির অবদান/গুরুত্ব (Importance of Biotechnology)

জীবপ্রযুক্তির বহু পদ্ধতি ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে এবং প্রয়োগ হচ্ছে। নিচে কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

১। **জিন প্রযুক্তিতে :** (i) উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে (মানুষের) ভাইরাস জীবাণু শনাক্তকরণ। (ii) বিভিন্ন প্রকার জিনগত ব্যাধি শনাক্তকরণ ও রোগ নিরাময়। (iii) বিভিন্ন জীবাণু প্রয়োগে জীবাণু অস্ত্র হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহার। (iv) বিভিন্ন টিউমার কোষকে নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি উৎপাদন ও সঠিক স্থানে প্রেরণ।

২। **এনজাইম প্রযুক্তিতে :** (i) উন্নতমানের এনজাইম উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনে এনজাইমের ব্যবহার। (ii) প্রাকৃতিক প্রোটিনের চেয়ে উন্নত পেপটাইড, নির্দিষ্ট ওষুধ, সঞ্চয়ী প্রোটিন প্রভৃতি জৈবযৌগের উৎপাদন।

৩। **কৃষিক্ষেত্রে :** (i) উদ্ভিদকোষ, টিস্যু ও অঙ্গের কালচার। (ii) সালোকসংশ্লেষণে বেশি সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন। (iii) রোগ-পতঙ্গ-বালাইনাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ জাত উৎপাদন। (iv) বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী সুস্থ ও সবল গবাদিপশু উদ্ভাবন। (v) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন।

৪। **চিকিৎসা শাস্ত্রে :** (i) বিভিন্ন জটিল রোগের প্রতিষেধক এবং রোগব্যাধি শনাক্তকরণের জন্য অ্যান্টিবডি উৎপাদন। (ii) ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন ও ইন্টারফেরনসহ নানা ধরনের হরমোন উৎপাদন। (iii) মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন। (iv) মস্তিষ্কে, হৃদপিণ্ডে ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন। (v) বর্তমানে ব্যাকফার্মের মাধ্যমে হরমোন, অ্যান্টিজেন ও ভিটামিন তৈরি করা হচ্ছে।

৫। **শিল্পক্ষেত্রে :** (i) শিল্পক্ষেত্রে অণুজীববিদ্যার জ্ঞানকে ভালোভাবে কাজে লাগিয়ে জীবপ্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের গুণগত ও পরিমাণগত উৎপাদন বাড়ানো। (ii) জৈবশক্তি উৎপাদন। (iii) অণুজীব থেকে খাদ্য উৎপাদন।

৬। **পরিবেশ রক্ষায় :** (i) কলকারখানায় নির্গত রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া প্রশমন ঘটানোর জন্য অণুজীবের ব্যবহার। (ii) মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য ও জঞ্জাল ধ্বংস ও পরিবেশ নির্মল করার কাজে অণুজীবের ব্যবহার। (iii) জিন ব্যাংকে স্থাপন করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা।

স্টার্টার কালচার →

উদ্ভিদ টিস্যু কালচার (Plant tissue culture)

উদ্ভিদের যেকোনো বিভাজনক্ষম অঙ্গ থেকে (যেমন-শীর্ষমুকুল, কক্ষমুকুল, কচি পাতা বা পাপড়ি ইত্যাদি) বিচ্ছিন্ন কোনো টিস্যু সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত (sterile) অবস্থায় উপযুক্ত পুষ্টি মাধ্যমে বৃদ্ধিকরণ (এবং পূর্ণাঙ্গ চারাউদ্ভিদ সৃষ্টি) করাকে টিস্যু কালচার বলে। অর্থাৎ গবেষণাগারে কোনো টিস্যুকে পুষ্টি মাধ্যমে কালচার করাই হলো টিস্যু কালচার। বহু পূর্ব থেকেই এ ধরনের ধারণা অনেকে পোষণ করতেন। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী Morgan (1901) সর্বপ্রথম মত প্রকাশ করেন যে প্রতিটি সজীব উদ্ভিদ কোষেরই একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে। এই ক্ষমতাকে তিনি টটিপোটেন্সি (Totipotency) বলে অভিহিত করেন। যেহেতু এ প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র অংশ ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা হয় এজন্য একে মাইক্রোপ্রোপাগেশন বলা হয়। আবার এ প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্ভিদের সমগুণসম্পন্ন প্রজন্ম বা ক্লোন তৈরি করা হয় বলে একে ক্লোনিং প্রযুক্তিও বলা হয়। টিস্যু কালচারের উদ্দেশ্যে মাতৃউদ্ভিদ হতে পৃথকীকৃত অংশকে এক্সপ্লান্ট বলা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদিত নতুন চারাকে অণুচারা (Plantlet) বলা হয়। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী Gottlieb Haberlandt (1902-)-কে টিস্যু কালচারের জনক বলা হয়। কারণ তিনিই সর্বপ্রথম টিস্যু

কালচার পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। এ পদ্ধতিকে **In-vitro কালচারও** বলা হয়। কারণ এ প্রক্রিয়াটি কাচপাত্রের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। ১৯৩০ এর দশকে ফরাসি বিজ্ঞানী Gautheret (১৯৩৯), আমেরিকান বিজ্ঞানী White (১৯৩৯) এবং অন্য একজন ফরাসি বিজ্ঞানী Nobercourt (১৯৩৯) পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের টিস্যু নির্দিষ্ট পুষ্টি মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ীভাবে আবাদ করতে সক্ষম হন।

টিস্যু কালচার, জীবপ্রযুক্তির একটি নতুন শাখা হলেও ইতোমধ্যে এ প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজনন, উন্নত উদ্ভিদ প্রকরণ উৎপাদন এবং মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলছে এবং এসব গবেষণালব্ধ ফলাফল মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের অর্থনীতিতে টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই বিশেষ অবদান রাখতে শুরু করেছে।

টিস্যু কালচারের প্রকারভেদ : টিস্যু কালচার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে: যেমন- কক্ষমুকুল কালচার (axillary bud culture), মেরিস্টেম কালচার, মাইক্রোপ্রোপাগেশন, ক্যালাস কালচার-এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন, দৈহিক কোষ থেকে ভ্রূণ উৎপাদন (somatic embryogenesis), পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন, প্রোটোপ্লাস্ট কালচার ইত্যাদি।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ : নিম্নলিখিত ধাপে টিস্যু কালচার পদ্ধতির বর্ণনা করা যায় :

১। মাতৃউদ্ভিদ বা এক্সপ্লান্ট নির্বাচন : এক্সপ্লান্ট হলো ঐ উদ্ভিদাংশ, টিস্যু কালচারে ব্যবহারের জন্য যাকে কোন উদ্ভিদ থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। কাজেই এক্সপ্লান্ট নির্বাচন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত কাণ্ডের শীর্ষমুকুল, পার্শ্বমুকুল এক্সপ্লান্ট হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়। পর্ব বা পাতার শীর্ষও ব্যবহৃত হয়। যে উদ্ভিদ থেকে এক্সপ্লান্ট নেয়া হবে বা হবে সেটি হলো মাতৃউদ্ভিদ। মাতৃউদ্ভিদটি অবশ্যই নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে। টিস্যু কালচারের জন্য সুস্থ, নীরোগ ও উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ থেকে টিস্যু সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত টিস্যুকে **এক্সপ্লান্ট** (explant) বলে।

চিত্র ১১.১ : টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার ক্রমিক পর্যায় বা ধাপসমূহ।

২। কালচার মিডিয়াম বা আবাদ মাধ্যম তৈরি : টিস্যু কালচার কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে একটি কালচার মিডিয়াম তৈরি করা আবশ্যক। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক উপাদান প্রয়োজন হয় তার সমন্বয়ে এ মিডিয়াম

Scanned by CamScanner

প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন ধরনের মুখ্য ও গৌণ উপাদান (macro and micro elements), ভিটামিন, সুক্রোজ (২-৪%), ফাইটোহরমোন প্রভৃতি এ মিডিয়ামে থাকা প্রয়োজন। মাধ্যমকে ঘন করতে জমাট বাঁধার উপাদান, যেমন- অ্যাগার সঠিক মাত্রায় মেশাতে হয়। মৌলিক উপাদান সমৃদ্ধ আবাদ মাধ্যমকে ব্যাসাল মিডিয়াম বলে। মিডিয়ামের pH ৫.৫-৫.৮ এর মধ্যে রাখা হয়।

৩। **জীবাণুমুক্তকরণ বা নির্বীজকরণ :** কালচার মিডিয়ামে থাকে পুষ্টি উপাদান, ফলে এতে সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। কিন্তু কালচার করার জন্য মিডিয়াম এবং এক্সপ্লান্ট সবই জীবাণুমুক্ত থাকা আবশ্যক। তাই মিডিয়ামকে কনিক্যাল ফ্লাস্ক বা টেস্ট টিউবে ঢেলে নির্বীজকৃত তুলা দিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয় যাতে বায়ু ঢুকতে না পারে। এরপর পাত্রটিকে নির্বীজকরণ যন্ত্র (autoclave) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়। মিডিয়ামকে অটোক্লেভ যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপ (১২১° সে.), চাপ (১৫ পাউন্ড) ও সময় (২০ মিনিট) রাখা হয়। জীবাণুমুক্ত পরিবেশে গবেষণাগারে কাচের পাত্রের মধ্যে কৃত্রিম আবাদ মাধ্যমে এক্সপ্লান্ট থেকে অণুচারা তৈরির পদ্ধতিই হলো **ইন-ভিট্রো কালচার**।

চিত্র ১১.১.১ : একটি টিস্যু কালচার ও বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার (আংশিক)

৪। **মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট বা টিস্যু স্থাপন :** এক্সপ্লান্টকে নির্বীজ করে (সাথে হাত, চিমটা ইত্যাদিকে অ্যালকোহল দিয়ে নির্বীজ করতে হয়) সম্পূর্ণ নির্বীজ অবস্থায় কাচপাত্রে রাখা মিডিয়ামে স্থাপন করা হয়।

৫। **ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি :** মিডিয়ামে এক্সপ্লান্ট তথা টিস্যু স্থাপনের পর পাত্রটিকে একটি বৈদ্যুতিক আলো (৩,০০০-৫,০০০ লাক্স), তাপমাত্রা (১৭°-২০° সে.) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৭০-৭৫%) নিয়ন্ত্রিত কক্ষে রাখা হয়। কয়েকদিন পর টিস্যুটি বার বার বিভাজিত হয়ে একটি কোষীয় মণ্ডে পরিণত হয়। মণ্ড হলো অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ। এক্সপ্লান্ট মিডিয়ামে স্থাপন করার পর আলো ও তাপ নিয়ন্ত্রিত করে রাখলে যে অবয়বহীন অবিন্যস্ত টিস্যুগুচ্ছ সৃষ্টি হয় তাই ক্যালাস। ক্যালাস থেকে এক সময় অসংখ্য মুকুল সৃষ্টি হয়।

৬। **মূল উৎপাদক মাধ্যমে স্থানান্তর ও চারা উৎপাদন :** মুকুলগুলোকে সাবধানে কেটে নিয়ে মূল উৎপাদনকারী মিডিয়ামে রাখা হয় এবং সেখানে প্রতিটি মুকুল, মূল সৃষ্টি করে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছে পরিণত হয়।

Scanned by CamScanner

৭। **চারা টবে স্থানান্তর :** উপযুক্ত সংখ্যক সুগঠিত মূল সৃষ্টি হলে পূর্ণাঙ্গ চারাগাছ কালচার করা পাত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে ার প্রক্রিয়ায় সাবধানতার সাথে টবে স্থানান্তর করা হয়। এভাবে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে চারাগাছ উৎপাদন কাজ সম্পন্ন রা হয়।

৮। **প্রাকৃতিক পরিবেশে তথা মাঠ পর্যায়ে স্থানান্তর :** টবসহ চারাগাছকে কিছুটা আর্দ্র পরিবেশে রাখা হয়, তবে রোপিত চারাগাছগুলো ঝক্ষের বাইরে রেখে মাঝে মাঝে বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। পূর্ণাঙ্গ চারাগাছগুলো সজীব ও সবল হয়ে উঠলে সেগুলোকে এক পর্যায়ে প্রাকৃতিক পরিবেশে মাটিতে লাগানো হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, টিস্যু কালচার প্রযুক্তিকে বর্তমানে অনেক ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রয়োগ পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যভেদে টিস্যু কালচার বিভিন্ন রকম হয়। কী ধরনের উদ্ভিদ থেকে কোন প্রকৃতি ও আকারের টিস্যু ব্যবহার করতে হবে এবং কী ধরনের কালচার মিডিয়াম ব্যবহার করা হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কালচারের উদ্দেশ্যের উপর। উপরে বর্ণিত কার্যপদ্ধতি প্রয়োগভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

কাজ : টিস্যু কালচার পদ্ধতির ধাপসমূহ ক্রমধারায় পোস্টার পেপারে উপস্থাপন কর।

উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নতজাত উদ্ভাবনে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির ব্যবহার (Application of tissue culture technology)

টিস্যু কালচার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে প্রজননবিদরা অনেক সাফল্যও অর্জন করেছেন। নিচে এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উপস্থাপন করা হলো।

চিত্র ১১.২ : টিস্যু কালচারের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগ

১। **হুবহু মাতৃ-গুণাগুণসম্পন্ন চারা উৎপাদন :** যে সব উদ্ভিদের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হয় না (যেমন- থুজা, সাগর কলা) সেসব উদ্ভিদের ক্ষেত্রে টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে চারাগাছ উৎপাদন ও বিপণন করা যায়।

ফুল, ফল বা শস্য উৎপাদনকারী কোনো ভালো জাতের উদ্ভিদ থেকে যদি অধিক সংখ্যক চারা উৎপাদন করা প্রয়োজন হয় তবে ঐ ভালোজাতের একটি উদ্ভিদ থেকে টিস্যু নিয়ে কালচার করে অনেক সংখ্যক চারাগাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এভাবে উৎপাদিত চারাগাছসমূহ হুবহু এদের মাতৃ-উদ্ভিদের মতো হয়ে থাকে। কাজেই একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উদ্ভিদ উৎপাদন করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি অত্যন্ত কার্যকর প্রক্রিয়া। তাই এ পদ্ধতি মাইক্রোপ্রোপাগেশন নামেও পরিচিত।

Scanned by CamScanner

২। **বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণে :** বর্তমানে অনেক বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদকে বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ স্বল্প সময়ে উল্লিখিত উদ্ভিদ থেকে চারাগাছ উৎপাদন করা এ প্রযুক্তি ব্যবহারেই সম্ভব।

৩। **ভ্রূণ কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদের কৃত্রিম প্রজনন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক হলো ভ্রূণকালচার। ভ্রূণকালচারের মাধ্যমে উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়। বিশেষ করে আন্তঃপ্রজাতি সংকরের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পূর্ণতা লাভ না করায় সংকর উদ্ভিদ পাওয়া সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সংকরায়নের পর ভ্রূণকালচার করা হয়। ফলে ভ্রূণ আর নষ্ট হয় না এবং পরবর্তীতে এ ভ্রূণ বিকাশ লাভ করে পূর্ণাঙ্গ সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন করে। এভাবে উৎপাদিত সংকর উদ্ভিদের সাহায্যে উন্নতজাত উদ্ভাবন করা সম্ভব।

৪। **সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রোটোপ্লাস্ট মিলন বা ফিউশন :** এ পদ্ধতি প্রয়োগ করে দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রোটোপ্লাস্ট সংযুক্তি ও তা থেকে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সংকর উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণ সংকরায়নের ক্ষেত্রে পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলনের সময় পুংগ্যামিটে সাইটোপ্লাজম খুবই কম থাকে এবং তা স্ত্রীগ্যামিটের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাস্টের মিলনে সোমাটিক হাইব্রিড তৈরি হলে সেখানে দুটি প্রজাতির সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে। এভাবে যখন দুটি কোষের মিলনে নিউক্লিয়াসের মিলন ঘটে না শুধু সাইটোপ্লাজমের মিলন ঘটে তখন তাকে সাইব্রিড (cybrid) বলে। প্রোটোপ্লাস্ট মিলনের মাধ্যমেই সাইটোপ্লাজমের বিশেষ গুণ স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ক্লোরোপ্লাস্ট ও মাইটোকন্ড্রিয়ার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ স্থানান্তর ঘটিয়ে নতুন জাতের উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। আলু ও টমেটো উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্ট ফিউশন করে সৃষ্ট নতুন উদ্ভিদের নাম দেয়া হয়েছে পোমাটো।

৫। **মেরিস্টেম কালচার :** মেরিস্টেম কালচার টিস্যু কালচার পদ্ধতির আর একটি বিশেষ দিক। উদ্ভিদের শীর্ষমুকুলের অগ্রভাগের টিস্যুকে মেরিস্টেম বলে। মেরিস্টেম কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারাগাছ সাধারণত রোগমুক্ত হয়ে থাকে, কারণ মেরিস্টেম টিস্যুতে কোনো রোগ-জীবাণু থাকে না।

৬। **অল্প সময়ে অধিক চারা উৎপাদন :** টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটিমাত্র উদ্ভিদ থেকে অল্প সময়ে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় চন্দ্রমল্লিকার একটি ছোট্ট অঙ্গজ টিস্যু থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৭। **হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন :** পরাগরেণু এবং পরাগধানী কালচার-এর মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপাদন করা সম্ভব। হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদসমূহ উদ্ভিদ প্রজননের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত হোমোজাইগাস লাইন পাওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। কিন্তু পরাগরেণু বা পরাগধানী কালচারের মাধ্যমে হ্যাপ্লয়েড উদ্ভিদ উৎপন্ন করা সম্ভব হলে তা থেকে সহজেই ইপ্সিত ডিপ্লয়েড উদ্ভিদ পাওয়া যায়। Poaceae, Solanaceae ও Brassicaceae গোত্রের হ্যাপ্লয়েড লাইন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।

৮। **কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ :** কোষ আবাদ ও ক্যালাস টিস্যু আবাদ কৌশলের মাধ্যমে উৎপন্ন দৈহিক ভ্রূণ থেকে বীজ উৎপন্ন করা যায়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশনের মাধ্যমে উন্নতজাত যেমন- Adhl নামক গম উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। যে কোনো আবাদী কোষ বা টিস্যু হতে সৃষ্ট প্রকরণকে বলে সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন। এর মাধ্যমে উন্নত কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উৎপন্ন করা হয়। সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েশন এর মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধী, পেস্টিসাইড প্রতিরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। আবাদী গ্যামিট কোষ হতে উৎপন্ন ক্লোনীয় প্রকরণকে বলে গ্যামিটোক্লোনাল ভ্যারিয়েশন।

৯। **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি :** প্রচলিত সংকরায়ন পদ্ধতিতে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সব ক্ষেত্রে উদ্ভিদে সংযোজন করা সম্ভব হয় না। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে নানা ধরনের অণুজীব, উদ্ভিদ ও প্রাণী হতে সংগৃহীত জিন আবাদকৃত ভ্রূণ বা কোষে

Scanned by CamScanner

প্রবেশ করিয়ে চাহিদা মতো জিনোম তৈরি করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তিতে এ কোষ বা ভ্রূণ হতে পূর্ণাঙ্গ ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি করা যায়। আগাছানাশকরোধী, পতঙ্গরোধী, উন্নত পুষ্টিমান সম্পন্ন ফসলী উদ্ভিদ যেমন- আলু, টমেটো, তামাক, তুলা, সয়াবিন, স্বর্ণধান (golden rice) ইত্যাদি উদ্ভিদ প্রজনন ও উন্নত উদ্ভিদ উৎপাদনে এক বিরাট বিপ্লব ঘটাতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশে টিস্যু কালচার পদ্ধতির প্রয়োগ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে আশির দশকের প্রথম দিক থেকে টিস্যু কালচারের কাজের সূত্রপাত হয় এবং বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগেই টিস্যু কালচার কাজ শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এ কাজ প্রসার লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগে বেশ কিছু উদ্ভিদ নিয়ে টিস্যু কালচার গবেষণা সম্পাদন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

(১) বিভিন্ন প্রকার দেশি ও বিদেশি অর্কিডের চারা উৎপাদন।

(২) কলার চারা উৎপাদন। বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষক পর্যায়ে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত চারা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরা রোগ প্রতিরোধক্ষম বলে উৎপাদনও ভালো।

(৩) চন্দ্রমল্লিকা, গ্লাডিওলাস, লিলি, কার্নেশান প্রভৃতি ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৪) কদম, জারুল, ইপিল ইপিল, বক ফুল, সেগুন, নিম প্রভৃতি কাঠ উৎপাদনকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

(৫) বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় ফসল ও বাদামের টিস্যু কালচার।

(৬) পাটের ভ্রূণ কালচার ও চারা উৎপাদন।

(৭) টিস্যু কালচার প্রয়োগ করে গোল আলুর রোগমুক্ত বীজ মাইক্রোটিউবার উৎপাদন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারেও টিস্যু কালচার বিষয়ক উন্নতমানের গবেষণা চলছে। উন্নতমানের বেলের চারা উৎপাদন এদের একটি সাফল্যজনক কাজ। শীতপ্রধান দেশের স্ট্রবেরী ফলের গাছকে বাংলাদেশের আবহাওয়ার উপযোগী জার্মপ্লাজম উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে আবাদকরণ। আকাশমনি উদ্ভিদের দ্রুতবর্ধনশীল ও কম সময়ে অধিকতর কাঠ উৎপাদনক্ষম চারা উৎপাদন এবং তরমুজের চারা উৎপাদন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাঁঠালের চারা উৎপাদনসহ আরও কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে। তন্মধ্যে রোগমুক্ত গোল আলুর মাইক্রোটিউবার (আলুবীজ) উৎপাদন এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ। গোলাপ, গ্লাডিওলাস, লালপাতা ও নানাধরনের অর্কিডের চারা উৎপাদন। ইপিল-ইপিল, মেহগনি ও কেলিকদম ইত্যাদি কাঠ প্রদানকারী উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের টিস্যু কালচার গবেষণাগারে দেশি ও বিদেশি নানা প্রকার অর্কিডের চারা উৎপাদন, মুগ কলাই ও মাষ কলাই ডালের রোগ প্রতিরোধক্ষম চারা উৎপাদন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া বর্তমানে বহু প্রাইভেট সংস্থা (NGO) তথা ব্র্যাক কর্তৃক *Stevia*, প্রশিকার বিদেশি অর্কিড ও গোল আলুর চারা উৎপাদন ও বিপণন বাংলাদেশে টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রসার এবং সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ : নিচে টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করা হলো-

সুবিধাসমূহ

১। একটি উদ্ভিদ বা উদ্ভিদাংশ হতে স্বল্প সময়ের মধ্যে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বহু চারা সৃষ্টি করা যায়।

২। সহজে রোগমুক্ত, বিশেষ করে ভাইরাসমুক্ত চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

৩। ঋতুভিত্তিক চারা উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা হতে মুক্ত হওয়া যায়।

৪। সঠিক বীজ সংগ্রহ ও মজুত করার সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৫। কলমে অক্ষম উদ্ভিদের চারা উৎপাদন।

Scanned by CamScanner

৬। অল্প পরিসরে অধিক চারা উৎপাদন।

৭। উদ্ভিদের যে কোনো টিস্যু থেকে চারা উৎপাদন।

৮। অতি সস্তায় বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন।

৯। বিদেশী জাতের উদ্ভিদ থেকে দেশী আবহাওয়া উপযোগী জাত সৃষ্টি করা।

১০। যে সমস্ত উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে না সেগুলোর চারা প্রাপ্তি ও স্বল্প খরচে দ্রুত সতেজ অবস্থায় স্থানান্তর করা যায়।

১১। বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ পুনঃউৎপাদন ও সংরক্ষণ করতে টিস্যু কালচার নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

অসুবিধাসমূহ

১। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হলো মূল্যবান যন্ত্রপাতি যেমন-ল্যামিনার ফ্লো, অটোক্লেভ ইত্যাদি। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ। এগুলো মূল্যবান হলেও অনেক সময় পাওয়া যায় না।

২। কোনো কারণে যদি মাল্টিপ্লিকেশনের সময় প্রাথমিক অবস্থায় আবাদকৃত টিস্যু জীবাণু দ্বারা (ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক) আক্রান্ত হয় তবে বহুসংখ্যক সম্ভাবনাময় চারা নষ্ট হয়ে যায়।

৩। সঠিকভাবে টিস্যু কালচার বা মাইক্রোপ্রোপাগেশনের কাজ করার জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবলের প্রয়োজন হয়।

৪। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো বেশ ক্ষুদ্রাকৃতির হওয়ায় এদের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে।

৫। উৎপন্ন চারাগুলো মাতৃ-উদ্ভিদের গুণসম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering)

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং জীববিজ্ঞানের একটি নবীনতম ও প্রয়োগমুখী শাখা। এর মূল লক্ষ্য কোনো কাঙ্ক্ষিত 'জিন' স্থানান্তরের মাধ্যমে উন্নতমানের নতুন জীবপ্রকরণ সৃষ্টি করা। কোনো জীবকোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্যকোনো জীবকোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করা বা নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে DNA অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষে, উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে, প্রাণী থেকে উদ্ভিদে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের জীবকে বলা হয় GMO (Genetically Modified Organism) বা GEO (Genetically Engineered Organism) বা ট্রান্সজেনিকস (Transgenic organism)। মানুষের ইনসুলিন তৈরির জিন ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করিয়ে এখন ঐসমস্ত ব্যাকটেরিয়া দিয়ে ইনসুলিন উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে সায়েন্স ফিকশন লেখক Jack Williamson তাঁর বিখ্যাত পুস্তক Dragon's Island-এ সর্বপ্রথম Genetic engineering শব্দটি ব্যবহার করেন।

একটি জীবের কোষ থেকে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে নিয়ে অন্য কোষের DNA এর সাথে সংযুক্ত করার ফলে যে নতুন (মিশ্রিত) DNA উৎপন্ন হয় তাকে **Recombinant DNA** বলে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর জন্য যে পদ্ধতি বা টেকনোলজি প্রয়োগ করা হয় তাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজি (recombinant DNA technology)। এ সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

Scanned by CamScanner

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

জিন প্রকৌশলগত যে প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জীবের DNA-তে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি বলে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট জিনসহ DNA অণুর অংশকে কোষের বাইরে এনে ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়। এভাবে গঠিত নতুন জিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা হয়। একে জিন ক্লোনিংও বলা হয়। এভাবে ক্লোন করা জিনটি চাহিদা অনুসারে ব্যবহার করা হয়, যেমন (i) প্রয়োজনীয় পরিমাণ প্রোটিন ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে উৎপাদন করা এবং (ii) অন্য কাঙ্ক্ষিত জীবে বিশেষ করে উদ্ভিদ বা প্রাণীতে ঢোকানোর মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক উৎপাদন করা। পরবর্তীতে ঐ জীবে নতুন জিনের বহিঃপ্রকাশকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি জীববিজ্ঞানের একটি নতুন শাখা। ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময়ে এর শুরু, কিন্তু ইতোমধ্যে মানব সমাজ এর থেকে লাভবান হতে শুরু করেছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ও ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উৎপাদন প্রক্রিয়া অণুজীবের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উদ্দিষ্ট অণুজীবসমূহের মধ্যে *E. coli*, *Agrobacterium tumefaciens* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব ব্যাকটেরিয়ার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের কোষে মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও একটি ছোট বৃত্তাকার DNA অণু থাকে, একে বলা হয় প্লাজমিড (plasmid)। প্লাজমিড-এর মাধ্যমে নতুন জিন-এর সংস্থাপন এবং সংস্থাপিত জিনকে অন্য জীবে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।

প্লাজমিড (Plasmid) : ক্রোমোসোম বহির্ভূত বৃত্তাকার DNA অণুকে প্লাজমিড বলা হয়। Laderberg (1952) *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাজমিডের সন্ধান পান। অধুনা কিছুসংখ্যক প্রকৃত কোষেও প্লাজমিডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেমন- ইস্ট। প্লাজমিডের DNA অণু স্বাধীনভাবে অনুলিপন (replicate) করতে পারে। মূল ক্রোমোসোমের বাইরে একটি অতিরিক্ত ও ক্ষুদ্রাকার DNA (ক্রোমোসোম) হিসেবে অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াতে প্লাজমিড অবস্থিত। এদের সংখ্যা কোষপ্রতি ১-১০০০ পর্যন্ত হতে পারে।

চিত্র ১১.৮ : *Agrobacterium tumefaciens* এর প্লাজমিড DNA।

প্লাজমিডের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১। প্লাজমিড বৃত্তাকার (চক্রাকার) দ্বি-সূত্রক DNA অণু।
২। এর আণবিক ভর প্রায় $10^6 - 200 \times 10^6$ dalton.
৩। প্লাজমিড অল্পসংখ্যক জিন বহন করে থাকে।
৪। রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা আদর্শ প্লাজমিডের নির্দিষ্ট স্থানগুলো কেটে ফেলা যায়।
৫। এরা অনুবন্ধনের মাধ্যমে সহজেই অন্য ব্যাকটেরিয়ায় সঞ্চালিত হয়।
৬। কোনো কোনো প্লাজমিডের জিন বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বস্তু সংশ্লেষণ করতে পারে, যেমন- colicin, vibriocin ইত্যাদি।

প্লাজমিডের প্রকারভেদ: প্লাজমিড প্রধানত তিন প্রকার, যথা-

(i) **F এবং F'-প্লাজমিড** : এসব প্লাজমিড একটি ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়াতে জেনেটিক উপাদান স্থানান্তর করার জন্য দায়ী। F(ertility) ও F'-প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়া দেহে Pili তৈরি করে, যা যৌনজননে সাহায্য করে।

(ii) **R-প্লাজমিড** : এসব প্লাজমিডে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী ক্ষমতাসম্পন্ন জিন থাকে। R_6-প্লাজমিড ছয়টি অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধে ক্ষমতাসম্পন্ন।

(iii) **কোল প্লাজমিড** : যে সব প্লাজমিডে কোলিসিন (Colicin) উৎপাদনকারী জিন থাকে তাদেরকে কোল প্লাজমিড বলে। কোলিসিন এক ধরনের প্রোটিন যা সংবেদনশীল *E. coli* কোষকে ধ্বংস করতে পারে। কোল প্লাজমিডের অনুরূপ আরেক ধরনের প্লাজমিড আছে যাতে ভিব্রিওসিন (Vibriocin) উৎপাদনকারী জিন থাকে। ভিব্রিওসিন সংবেদনশীল *Vibrio cholerae* কোষকে ধ্বংস করে দেয়।

Scanned by CamScanner

প্লাসমিডের ব্যবহার : আণবিক বংশগতিবিদ্যার (molecular genetics) গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্লাসমিড ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জিন ক্লোনিং ইত্যাদি কাজে প্লাসমিড অত্যন্ত উপযোগী বাহক (vector) হিসেবে কাজ করে। প্লাসমিড DNA ব্যবহার করে আধুনিক জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে; যেমন, মানুষের ইনসুলিন জিন ক্লোনিং, রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার প্রধান ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA (টারগেট DNA) নির্বাচন।

(খ) একটি বাহক নির্বাচন, যার মধ্যে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডটি প্রতিস্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্লাসমিড DNA কে ব্যবহার করা হয়।

(গ) বাহকের DNA অণুর নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন।

(ঘ) ছেদনকৃত DNA খণ্ডসমূহ (কাঙ্ক্ষিত DNA ও বাহক) সংযুক্ত করার জন্য DNA লাইগেজ এনজাইম দ্বারা জোড়া লাগানো।

(ঙ) কাঙ্ক্ষিত DNA সহ বাহক DNA-এর অনুলিপনের জন্য একটি পোষক (host) নির্বাচন (যেমন- *E. coli*)।

(চ) কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত রিকম্বিনেন্ট DNA-এর বহিঃপ্রকাশ মূল্যায়ন।

(ছ) রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, রিকম্বিনেন্ট DNA কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করানো।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ কোষে কাঙ্ক্ষিত জিনকে *Agrobacterium* দ্বারা স্থানান্তর করানো।

রিকম্বিনেন্ট DNA-এর ধাপসমূহের বর্ণনা :

(ক) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন ও পৃথকীকরণ : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির প্রথম পদক্ষেপ হলো কাঙ্ক্ষিত DNA অণু নির্বাচন। নির্বাচনের পর কাঙ্ক্ষিত জীবের কোষ থেকে DNA-কে পৃথক করতে হবে। প্রথমে কোষকে লাইসিস (lysis) করা হয় এবং কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রোটিন, শর্করা, লিপিড প্রভৃতি অণু হতে DNA অণুকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। এই DNA-এর সাথে কিছু পরিমাণ RNA ও প্রোটিন মিশ্রিত থাকে। পরবর্তীতে ইথিজিয়াম ব্রোমাইড ও সুক্রোজ গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউজের মাধ্যমে উক্ত মিশ্রণকে নির্দিষ্ট ব্যান্ড আকারে পৃথক করা হয় এবং কাঙ্ক্ষিত DNA ব্যান্ডকে পৃথকভাবে আহরণ করে নেয়া হয়। বর্তমানে সিলিকা নির্ভর কিট ব্যবহার করে এই কাজটি অনেক সহজে করা যায়।

রেস্ট্রিকশন এনজাইম (Restriction enzyme) : যে এনজাইম প্রয়োগ করে DNA অণুর সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স-এর একটি অংশ কেটে নেয়া যায় ঐ এনজাইমকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম বলে। এদেরকে রেস্ট্রিকশন এন্ডোনিউক্লিয়েসেস (endonucleases)ও বলা হয়। এরা DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সিকোয়েন্স, যাকে রেস্ট্রিকশন সাইট (restriction site বা recognition site) বলা হয়, তা কেটে দিতে সক্ষম। এ ধরনের এনজাইম প্রাকৃতিকভাবেই ব্যাকটেরিয়া কোষে বিদ্যমান থাকে। এদের কাজ হলো ব্যাকটেরিয়াকে আক্রমণকারী ভাইরাল DNA কেটে দেয়া। স্বাভাবিকভাবে এরা ভাইরাল DNA কেটে থাকে, তবে যে কোনো উৎস থেকে পাওয়া যে কোনো DNA সূত্রের নিউক্লিয়োটাইডের ঐ একই সিকোয়েন্স (রেস্ট্রিকশন সাইট) সমান দক্ষতার সাথে কাটতে সক্ষম।

প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াম কোষ কমপক্ষে একটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন করে থাকে। শত শত প্রকার ব্যাকটেরিয়া কোষে শত শত ধরনের রেস্ট্রিকশন এনজাইম উৎপন্ন হয়। এরা DNA সূত্র কাটার জন্য নিজস্ব সিকুয়েন্স শনাক্ত করতে পারে এবং ঐ রেস্ট্রিকশন সাইট কেটে দিতে পারে।

(খ) বাহক নির্বাচন : কাঙ্ক্ষিত DNA-এর প্রয়োজনীয় অংশ বহন করার জন্য একটি বাহক (vector) নির্বাচন করতে হয়। ব্যাকটেরিয়াতে অবস্থিত প্লাজমিড-DNA-কে কাঙ্ক্ষিত DNA বহন করার জন্য বাহক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই বাহক প্লাসমিড DNA-কে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন (modify) করে নেয়া হয়। যেমন- (i) কাঙ্ক্ষিত DNA থেকে রিকম্বিনেন্ট প্রোটিন তৈরি করতে চাইলে বাহকের ভেতর কাঙ্ক্ষিত DNA-র 5′-প্রান্তে প্রোমোটার ও 3′-প্রান্তে টারমিনেটর

Scanned by CamScanner

সিকোয়েন্স যোগ করতে হয়। (ii) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে উদ্ভিদ কোষে প্রতিস্থাপন করতে হলে কাঙ্ক্ষিত DNA *Agrobacterium tumefaciens*-এর Ti-প্লাসমিডের T-DNA-র ভেতরে প্রোমোটার ও টারমিনেটরসহ স্থাপন করতে হয়। (iii) সাধারণভাবে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্য হলে সাধারণ প্লাসমিডে স্থাপন করতে হয়।

(গ) কাঙ্ক্ষিত DNA-কে নির্দিষ্ট স্থানে (specific site) ছেদন : সুনির্দিষ্ট রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত DNA-এর নির্দিষ্ট অংশকে খণ্ড করা হয়। একই এনজাইম প্রয়োগ করে বাহক DNA তেও (যেমন-*A. tumefaciens*-এর Ti প্লাসমিড DNA) ছেদন করে নেয়া হয় (চিত্র : ১১.৪, ১১.৫)।

[কাঙ্ক্ষিত DNA-ই এ সংক্রান্ত DNA খণ্ড বহন করে। বিভিন্ন জীবের জন্যই লাইব্রেরি আছে, যেমন- *E. coli* লাইব্রেরি, মানব জিনোম লাইব্রেরি ইত্যাদি। এখন আবার কমপ্লিমেন্টারি DNA (cDNA) লাইব্রেরিও আছে। cDNA হলো mRNA-এর কমপ্লিমেন্টারি কপি। যে সব জিন বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম সে সব জিন cDNA লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। একজন গবেষক cDNA লাইব্রেরি থেকে তাঁর কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড পেতে পারেন। **DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব** (কাঙ্ক্ষিক DNA সিকোয়েন্সের সম্পূরক একক শৃঙ্খল রেডিওঅ্যাকটিভ DNA খণ্ড) ব্যবহার করে (কারণ এই প্রোব কাঙ্ক্ষিত DNA-এর সাথে হাইব্রিডাইজ করবে) লাইব্রেরি থেকে ক্লোন শনাক্ত করে PCR-এর মাধ্যমে সেই কাঙ্ক্ষিত সিকোয়েন্স খণ্ড বের করে আনা যাবে। বর্তমানে জিন মেশিনের (automated chemical Synthesis apparatus) সাহায্যে সহজেই DNA হাইব্রিডাইজেশন প্রোব ও PCR-এ ব্যবহৃত প্রাইমার তৈরি করা যায়।]

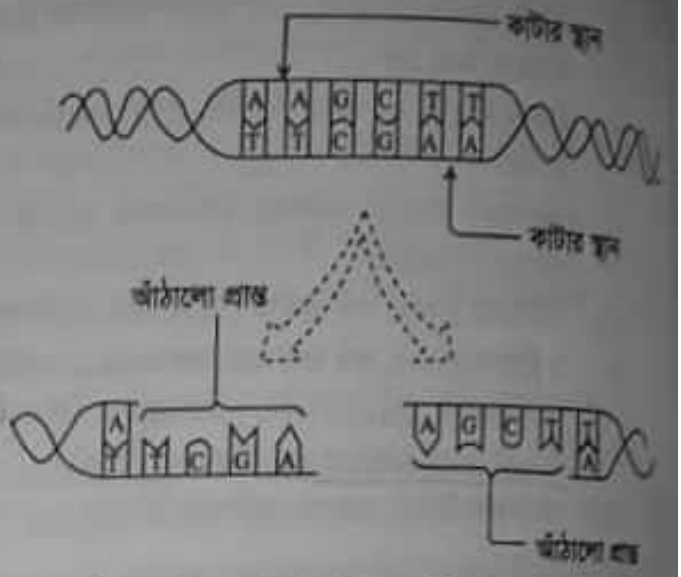

চিত্র ১১.৪ : রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে DNA কর্তন।

বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া থেকে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক রেস্ট্রিকশন এনজাইম পৃথক করা হয়েছে; যেমন- Eco RI (*Escherichia coli* Ry 13), Hind III (*Haemophilus influenzae* Rd), Bam HI (*Bacillus amyloliquefaciens* H) প্রভৃতি। রেস্ট্রিকশন এনজাইমসমূহ DNA অণুর একটি সুনির্দিষ্ট সাজান পদ্ধতির (specific base sequences) অংশকে কেটে দেয় এবং একই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা প্লাসমিডের ঐ একই বেস সিকোয়েন্সবিশিষ্ট অংশকে কাটা যায়। সাধারণত এরা ৪–৬ জোড়া বেস অংশ কেটে থাকে। রেস্ট্রিকশন এনজাইমকে DNA অণু কর্তনের সূক্ষ্ম ছুরি (molecular scissors-আণবিক কাঁচি বা বায়োলজিক্যাল নাইফ) হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কয়েকটি রেস্ট্রিকশন এনজাইম ও এদের রেস্ট্রিকশন স্থান নিচে দেখানো হলো :

এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান	এনজাইম	রেস্ট্রিকশন স্থান
Bam HI	G | GATCC CCTAG | G	Hpa II	C | CGG GGC | C
Hind III	A | AGCTT TTCGA | A	Mbo I	| GATC CTAG |
Eco RI	G | AATTC CTTAA | G		

\| দিয়ে DNA অণুর কাটার স্থান দেখানো হয়েছে।

(ঘ) ছেদনকৃত কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে বাহক প্লাসমিড DNA-তে স্থাপন : প্লাসমিড DNA হতে বের করে নেয়া অংশের ফাঁকা স্থানে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে প্রতিস্থাপন করা হয়। DNA-ligase এনজাইম ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ডকে প্লাসমিড DNA-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়। ফলে প্লাসমিড DNA-টি কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড বহন করে। কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড প্লাসমিড DNA-তে সংযুক্ত হবার ফলে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি হলো।

Scanned by CamScanner

(ঙ) পোষক (host) নির্বাচন ও রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড DNA পোষকদেহে প্রবেশ করানো : রিকম্বিনেন্ট DNA অণুকে পরে কোনো পোষক ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাকটেরিয়া অন্য প্লাসমিড গ্রহণ করে না। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ করে **heat shock**-এর মাধ্যমে বিশেষ পরিবেশ সৃষ্টি করলে প্লাসমিড গ্রহণ করতে পারে। প্লাসমিড গ্রহণ করলে ঐ ব্যাকটেরিয়ামকে **ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়াম** (transformed bacterium) বলে। পরবর্তীতে ট্রান্সফরমড ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডটিও সংখ্যাবৃদ্ধি করে বলে একে ক্লোনিংও বলা হয়। DNA অনুপ্রবেশের অন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হলো **electroporation**।

চিত্র ১১.৫ : রিকম্বিনেন্ট DNA সৃষ্টি।

(চ) রিকম্বিনেন্ট DNA-এর মূল্যায়ন : সাধারণত রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার কাজটি সফলভাবে হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ঐ ব্যাকটেরিয়াম (পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্তকৃত) অ্যাগার মিডিয়ামে জন্মিয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে পোষক ব্যাকটেরিয়া recombinant plasmid বহন করছে কিনা তা শনাক্ত করার জন্য অ্যাগার মিডিয়ামে নির্দিষ্ট antibiotic ব্যবহার করতে হয় কারণ বাহক প্লাসমিডে ঐ antibiotic এর resistance gene রয়েছে।

রিকম্বিনেন্ট DNA কাঙ্ক্ষিত জিন বহন করছে কিনা তা শনাক্তকরণ : এটি করা হয় (i) PCR পদ্ধতিতে, (ii) Restriction digestion-এর মাধ্যমে এবং (iii) জেনেটিক প্রোব-এর মাধ্যমে। **জেনেটিক প্রোব** (genetic probe) device মেটাল ডিটেক্টর-এর তুলনীয় একটি উপায়। জেনেটিক প্রোব হলো রেডিও অ্যাকটিভলি চিহ্নিত **টার্গেট জিনের** (কাঙ্ক্ষিত জিনের) পরিপূরক এক স্ট্র্যান্ডবিশিষ্ট DNA বা mRNA।

(ছ) রিকম্বিনেন্টকে DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির সময় বাহক হিসেবে Ti প্লাসমিড ব্যবহার করে থাকলে ঐ DNA-কে *Agrobacterium*-এ স্থানান্তর করতে হয়।

(জ) কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রবেশ করানো : কাঙ্ক্ষিত জিন সমৃদ্ধ কোনো কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ সৃষ্টি করতে হলে কাঙ্ক্ষিত জিনকে কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদকোষে *Agrobacterium tumefacians*-এর মাধ্যমে বা অন্য পদ্ধতিতে স্থানান্তর করতে হবে এবং পরে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় ঐ কোষ থেকে নতুন ও কাঙ্ক্ষিত জিনসহ নতুন প্রকৃতির উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। এরূপ উদ্ভিদকে **ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ** (transgenic plant) বলে। এখানেই টিস্যু কালচারের সাথে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সম্পর্ক।

Implanta পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। *Arabidopsis* উদ্ভিদের পুষ্পমঞ্জরীকে *Agrobacterium* সাসপেনসনে নির্দিষ্ট সময় ডুবিয়ে রেখেও সহজে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ তৈরি করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় টিস্যু কালচারের দরকার পড়ে না।

জিন ক্লোনিং (Gene cloning)

একই জিনোটাইপ বিশিষ্ট একাধিক জীব বা জীবাংশকে ক্লোন বলা হয়। একটি জবা গাছ থেকে ১০টি ডাল কেটে চারা করলে এরা হবে হুবহু একই জিনোটাইপ সম্পন্ন এবং এরা হলো ক্লোন। ক্লোন মাতৃউদ্ভিদের গুণ বৈশিষ্ট্য বহন করে। সাধারণত কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদ থেকে এই ক্লোনিং করা হয়। মনে করি একটি চা গাছের চা উত্তম মানের হয়, কাজেই ঐ গাছটি হলো কাঙ্ক্ষিত গাছ। ঐ গাছ থেকে ক্লোন করে বাগান বৃদ্ধি করলে পুরো বাগান থেকেই উন্নতমানের চা পাওয়া যাবে। এখানে চা বাগানে ক্লোনাল পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

জিন ক্লোনিং হলো কোনো জীবের DNA পৃথক করে তা থেকে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কাঙ্ক্ষিত জিন চিহ্নিত করে জিনকে হুবহু কপি করা। সহজ কথায় কোনো কাঙ্ক্ষিত জিনকে হুবহু কপি করা বা সংখ্যাবৃদ্ধি করাই হলো জিন ক্লোনিং।

Scanned by CamScanner

একটি ক্রোমোসোমের DNA-তে অসংখ্য জিন থাকতে পারে। এর সবগুলোই কাঙ্ক্ষিত জিন নয়। কেননা, নির্দিষ্ট জি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে, তাই প্রথমে কাঙ্ক্ষিত প্রোটিন খোঁজা হয় এবং ঐ প্রোটিন উৎপাদনকারী জিন খুঁজে বের করা হয়। সাধারণত বিজ্ঞানিগণ জীবের DNA-এর ক্যাটালগের জিন লাইব্রেরি তৈরি করেন এবং ঐ জিন লাইব্রেরি থেকে কাঙ্ক্ষিত জিন খুঁজে বের করেন।

গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করার জন্য অথবা উন্নতমানের প্রোটিন তৈরির জন্যই হোক রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির একটি উদ্দেশ্যই হলো বিশেষ জিনের বহু কপি তৈরি করা। **একটি জিনের বহু সংখ্যক হুবহু কপি তৈরি করাই হলো জিন ক্লোনিং।**

জিন ক্লোনিং-এর জন্য জিন-এর উৎস : তিনটি উৎস থেকে তা পাওয়া যায়–

i. বিনা ক্রাইটেরিয়ায় (random) তৈরি ক্রোমোসোমের খণ্ড যা ভেক্টর-এ অন্তর্ভুক্ত করা। এগুলো জিন-লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

ii. সুনির্দিষ্ট mRNA থেকে রিভার্স ট্রান্সক্রিপশনে করা কমপ্লিমেন্টারি DNA।

iii. গবেষণাগারে অর্গানিক কেমিস্টগণ কর্তৃক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত DNA খণ্ড।

PCR (পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন) : ১৯৮৪ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী Kary Mullis কোষ বহির্ভূতভাবে DNA ক্লোনিং এর দ্রুততম এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রযুক্তিকে **পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা PCR** বলা হয়। একটি টেস্ট টিউবে একটি জিনের বহু কপি করা যায় PCR এর মাধ্যমে। প্রথমে দ্বিসূত্রক DNA-কে ৯০° সে. তাপমাত্রায় একক সূত্রক করা হয়। DNA রেপ্লিকেশনের জন্য ৫′-প্রান্তে একটি প্রাইমার যুক্ত করা হয়। একটি আদর্শ প্রাইমার ১২ থেকে ২০ বেইস পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। DNA পলিমারেজ তখন সম্পূরক সূত্র তৈরি করে দেয়। কয়েক মিনিটেই কপি তৈরি হয় এবং অল্পসময়ে অসংখ্য কপি তৈরি হয়ে যায়। এটি খুবই সহজ একটি উপায়। সাধারণত এই সূত্র তৈরির হার ১০০০ বেস প্রতি মিনিটে। তবে বর্তমানে মিউটেশন পদ্ধতি দ্বারা এই হার আরো বাড়ানো হয়েছে, ১০০০ bp প্রতি সেকেন্ডে।

বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং : বিভিন্ন প্রকার ক্লোনিং পদ্ধতি আছে। নিচে এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

(i) DNA ক্লোনিং : রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরির মাধ্যমে DNA ক্লোনিং করা হয়। এটি জিন ক্লোনিং নামেও পরিচিত। কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত DNA খণ্ড কেটে উপযুক্ত ব্যাকটেরিয়ামের প্লাসমিড DNA-তে প্রতিস্থাপন করা হয়, ফলে প্লাসমিড DNA টি একটি রিকম্বিনেন্ট DNA-তে পরিণত হয়। উপযুক্ত মাধ্যমে এই রিকম্বিনেন্ট DNA যুক্ত ব্যাকটেরিয়াম আবাদ করলে অল্প সময়ে হাজার হাজার ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হবে এবং প্রতিটি ব্যাকটেরিয়ামে ঐ কাঙ্ক্ষিত জিন থাকবে। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত জিনের অসংখ্য ক্লোন তৈরি করা হয়।

(ii) রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং : জনন পদ্ধতিতে দাতা কোষের DNA-এর মাধ্যমে তার হুবহু প্রতিচ্ছবি সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করার কৌশল হলো রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং। ডলি নামক ভেড়ার সৃষ্টি এই পদ্ধতিতে করা হয়েছে। একটি ভেড়ার স্তন গ্রন্থি থেকে কোষ নিয়ে (একটি দাতা কোষ বা দাতা ভেড়া) তাকে আবাদ মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পরে একটি ভেড়ার ডিম্বাণু কোষ (গ্রহীতা কোষ) নিয়ে তা থেকে নিউক্লিয়াস সরিয়ে তদস্থলে দাতা কোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানো হয়। ডিম্বাণুটি দাতা কোষের নিউক্লিয়াস নিয়ে বিভাজিত হয়ে ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছায়। এ ভ্রূণ তৃতীয় একটি ভেড়ার জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। তৃতীয় ভেড়াটি নির্দিষ্ট সময় পর দাতা ভেড়ার চেহারা সম্পন্ন একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। এর নাম দেয়া হয়েছিল ডলি (১৯৯৬ সালে ডলির জন্ম হয়)। ডলির জন্মই রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং এর উদাহরণ। একইভাবে মানব ক্লোন করাও সম্ভব হচ্ছে।

জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির প্রয়োগ

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের বহুল আলোচিত ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি বিজ্ঞান। জীবন-জীবিকার প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত। নিচে এই প্রযুক্তির কয়েকটি প্রায়োগিক ব্যবহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১। **কৃষিক্ষেত্রে :** কৃষিক্ষেত্রে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন-

(ক) ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ : আমেরিকান তুলা গাছে পোকার (Cotton bollworm) আক্রমণের ফলে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ উৎপাদন হ্রাস পেতো। পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তাই ব্যবহার করতে হতো ইনসেক্টিসাইড

Scanned by CamScanner

(insecticides = পতঙ্গনাশক)। *Bacillus thuringiensis* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে একটি জিন যোগ করার মাধ্যমে ট্রান্সজেনিক তুলা গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই ট্রান্সজেনিক তুলা গাছে পোকার জন্য বিষাক্ত প্রোটিন সৃষ্টি হয় যার ফলে এখন আর ঐ পোকার আক্রমণ ঘটে না। এর ফলে ঐ তুলার ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার পতঙ্গনাশক ব্যবহার করতে হয় না বলে উৎপাদন ব্যয় কমে গেছে এবং জমির উপরের মাটি, পানি এবং বায়ু দূষণও হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় চাষকৃত ভুট্টার ৪০ ভাগ, তুলার ৫০ ভাগ এবং সয়াবিনের ৪৫ ভাগই ট্রান্সজেনিক প্রকরণ। বাংলাদেশেও এখন Bt cotton, গোল্ডেন রাইস, লেটব্লাইট রোগ প্রতিরোধক্ষম আলু চাষের ট্রায়াল চলছে, কৃষক পর্যায়ে এখনও দেয়া হয় নি।

বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উচ্চ শ্রেণির উদ্ভিদ প্রজাতিতে ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়া সফলভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, পেঁপে, ভুট্টা, রাই, সূর্যমুখী, তুলা, নাশপাতি, গম, আঙ্গুর ইত্যাদি।

আগাছা নিধনকারী পদার্থ সহনশীল উদ্ভিদ

গ্লাইকোসেট একটি আগাছা নিধনকারী পদার্থ যা পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক ৭৮ আগাছার মধ্যে ৭৬টি ধ্বংস করতে সক্ষম। তবে এটি আগাছার সাথে ফসল উদ্ভিদও নষ্ট করে ফেলে। কাজেই ফসল লাগানোর আগেই জমিতে আগাছানাশক দেয়া ভালো। কিন্তু ফসল লাগানোর পরও জমিতে পুনরায় আগাছা জন্ম নেয়, তখন অতি সাবধানে এটি ব্যবহার করতে হয়।

কতক ব্যাকটেরিয়া একটি এনজাইম তৈরি করে থাকে যা গ্লাইকোসেট ভেঙ্গে দিতে পারে। বিজ্ঞানীগণ ব্যাকটেরিয়া থেকে এই জিন পৃথক করে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তিতে তুলা ও সয়াবিন উদ্ভিদে অন্তর্ভুক্ত করে ট্রান্সজেনিক তুলা ও ট্রান্সজেনিক সয়াবিন উদ্ভিদ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এসব ফসলের জমিতে এখন নিশ্চিন্তে গ্লাইকোসেট হার্বিসাইড (herbicide) প্রয়োগ করা চলে।

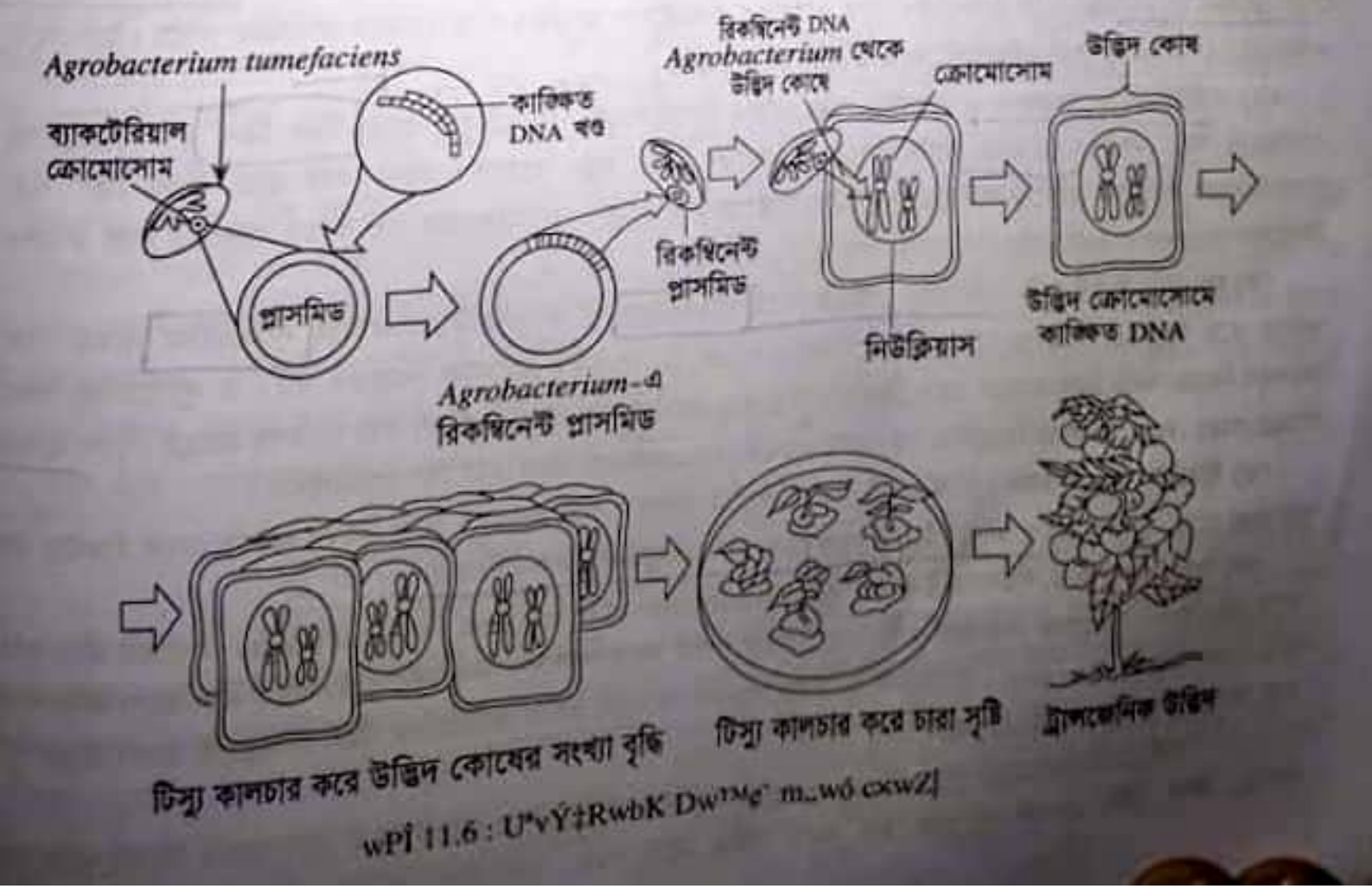

wPÎ 11.6 : U'vÝ‡RwbK Dw™¢` m„wó cxwZ|

Scanned by CamScanner

(খ) গুণগত মান উন্নয়নে : অস্ট্রেলিয়াতে ভেড়া পালন একটি উত্তম ব্যবসা। ভেড়া থেকে পাওয়া যায় পশম এবং মাংস। এরা ক্লোভার জাতীয় ঘাস খায়। ঐ ঘাসের প্রোটিনে সালফারের অভাব আছে। এর ফলে যে ভেড়া ক্লোভার ঘাস খায় এদের লোম নিম্নমানের হয়। লোমকে উন্নতমানের করতে হলে এদেরকে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন *Agrobacterium tumefaciens* ব্যাকটেরিয়ার প্লাসমিড DNA-এর মাধ্যমে ক্লোভার ঘাসে স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে কেবল ঐ ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাদ্য দেয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। সূর্যমুখীর সালফার তৈরিকারী জিন সমৃদ্ধ ক্লোভার ঘাস হলো একটি ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ।

(গ) সুপার রাইস (Super rice) বা গোল্ডেন রাইস (Golden rice) : বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ছোট ছেলে-মেয়েদের ভিটামিন-A এর অভাব রয়েছে। এর ফলে কেবল বাংলাদেশেই প্রতি বছর হাজার হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত ভিটামিন-A সমৃদ্ধ খাবারের অভাবেই এরূপ হয়ে থাকে। এশিয়ার লোকদের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই ভাতের মাধ্যমে ভিটামিন-A এর অভাব পূরণ করতে পারলেই আমাদের সন্তানেরা আর রাতকানা বা অন্ধ হবে না। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুইডেনের বিজ্ঞানী Ingo Potrykus (1999) ও তাঁর সহযোগীরা উদ্ভাবন করেন সুপার রাইস। তাঁরা *Japonica* টাইপ ধানে, ড্যাফোডিল থেকে বিটা ক্যারোটিন তৈরির চারটি জিন এবং অতিরিক্ত আয়রন তৈরির তিনটি জিন প্রতিস্থাপন করেন। এই ধানের ভাত খেলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার ভাতপ্রিয় জনগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ ছেলে-মেয়েরা ভিটামিন-A এর অভাবজনিত কারণে আর অন্ধ হবে না এবং মায়েরা দেহে রক্তশূন্যতার জন্য সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ থেকে রেহাই পাবে। এখন সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস চাষ শুরু হয়েছে।

(ঘ) রোগ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে : ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ফলে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। টোবাকো মোজাইক ভাইরাস, পটেটো ভাইরাস-এর কোট প্রোটিন (CP) জিন দিয়ে ট্রান্সফর্মেশনকৃত তামাক গাছ ভাইরাস আক্রমণ হতে নিজেকে প্রতিরোধ করছে। ইতোমধ্যে একইভাবে পেঁপের রিংস্পট প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

(ঙ) নাইট্রোজেন সংবন্ধনে : বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া হতে 'নিফ জিন' (যা নাইট্রোজেন সংবন্ধনের জন্য দায়ী) *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'নিফ জিন' বাহী ব্যাকটেরিয়ার ব্যবহার জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ কমাতে বা একেবারে বন্ধ করতে পারবে। ফলে ফসলের উৎপাদন খরচ কমবে এবং পরিবেশ দূষণ রোধ হবে।

(চ) দ্যুতিময় উদ্ভিদ সৃষ্টি : জোনাকি পোকার দেহে লুসিফারেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে 'লুসিফেরিন' নামক পদার্থ ক্ষরিত হয়ে আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে। তাই জোনাকি পোকা উড়ার সময় আলোক বিচ্ছুরিত হয়। এ লুসিফেরিন পদার্থ নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন তামাক গাছে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছে। ফলে তামাক গাছের পাতা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। তাই রাতের বেলা অন্ধকার স্থানে এরা বেশ শোভাবর্ধক।

(ছ) বীজহীন ফল সৃষ্টিতে : রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে সারা বিশ্বের অনেক দেশে বীজহীন ফল সৃষ্টি করা হচ্ছে; যেমন- জাপানে বীজহীন তরমুজ উদ্ভাবন এ প্রযুক্তিরই এক প্রতিফলন।

(জ) ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী উদ্ভিদ সৃষ্টি (Production of insect pest resistant plant) : অনেক কীট-পতঙ্গ আছে যারা ফসল উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। এর ফলে ফসলের উৎপাদন হ্রাস পায়। এরা হলো ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ অর্থাৎ insect pest। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এসব ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গরোধী ফসল উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো।

(i) ইউরোপিয়ান কর্নবোরার (European corn-borer) এক প্রকার মথ। এদের লার্ভা ভুট্টা গাছের বিশেষ ক্ষতি করে থাকে, ফলে ভুট্টার ফলন শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে *Bacillus*

Scanned by CamScanner

thuringiensis-এর একটি জিন ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে এই ক্ষতিকারক কর্নবোরার প্রতিরোধী ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। *Bacillus thuringiensis* ব্যাকটেরিয়াতে একটি প্রোটিন তৈরি হয় যা কীট-পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত, কিন্তু মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বিষাক্ত প্রোটিন তৈরিকারী 'জিন'কে ভুট্টা উদ্ভিদে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একটি নতুন জাত তৈরি করা হয়েছে যা পতঙ্গের জন্য বিষাক্ত ঐ প্রোটিন উৎপাদন করতে পারে। এর ফলে ভুট্টার ঐ নতুন উদ্ভাবিত জাত কর্নবোরার দ্বারা আক্রান্ত হয় না (কর্নবোরার নিজেরাই মরে যায়)। এর ফলে ভুট্টার ফলন হ্রাস পায় না, ফলন বাড়লে অথবা ফলন হ্রাস না পেলে উৎপাদন খরচ কম পড়ে, ক্ষতিকারক রাসায়নিক ইনসেক্টিসাইড ব্যবহার করতে হয় না, তাই উৎপাদন খরচ আরও কমে যায়। এছাড়া ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড বৃষ্টির পানির সাথে গড়িয়ে পুকুর, ডোবা, নদী-নালায় পড়ে জলজ ইকোসিস্টেমের যে মারাত্মক ক্ষতি করে তা থেকেও পরিবেশ রক্ষা পায়। ইনসেক্টিসাইড ছিটানো ফসল থেকে মানুষের দেহে ক্ষতিকারক ইনসেক্টিসাইড প্রবেশ করে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তা থেকেও মানুষ রক্ষা পায়।

কাজেই পতঙ্গনিরোধী ফসল উদ্ভিদ চাষে খরচ কম পড়ে, উৎপাদন বাড়ে, মানব স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষা পায়।

(ii) *Bacillus thuringiensis* (Bt) একটি মৃত্তিকাবাসী বড় আকৃতির ব্যাকটেরিয়া। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের মাটিতে এটি বিরাজমান আছে। গবেষণাগারে অধিক পরিমাণে উৎপাদন করে বায়ো-ইনসেক্টিসাইড হিসেবে ফসলে (যেমন বেগুন, ফুলকপি ইত্যাদিতে) প্রয়োগ করলে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল রক্ষা পায়, ফলন হ্রাস পায় না, পরিবেশের এবং মানবদেহেরও কোনো ক্ষতি হয় না। বাংলাদেশে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ মোটামুটি সন্তোষজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

(iii) **স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক (Sterile Insect Technique = SIT)** : এটি একটি আধুনিক জীবপ্রযুক্তি (যদিও রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি নয়)। SIT হলো একটি পরিবেশ বান্ধব ক্ষতিকারক পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। Edward Kripling ও Raymond Bushland ১৯৩৭ সালে এই পদ্ধতির প্রস্তাবক। ফসলে বা জমিতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পতঙ্গনাশক প্রয়োগ না করে বায়োলজিক্যাল ইনসেক্ট কন্ট্রোল পদ্ধতিতে ক্ষতিকর পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক পতঙ্গের পুরুষগুলোকে বন্ধ্যা করে দেয়া হয় (প্রধানত রেডিয়েশন প্রয়োগের মাধ্যমে)। এর ফলে স্ত্রী পতঙ্গসমূহ কার্যকর ডিম উৎপাদনে অক্ষম হয়, ফলে নতুন প্রজন্ম বিকশিত হতে পারে না। তাই কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ক্ষতিকারক পতঙ্গটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মশা নিয়ন্ত্রণের এটি একটি কার্যকরী উপায়। আবার শাকসবজি ও ফলমূলের ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গও এই পদ্ধতিতে দমন করা সম্ভব। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি এখনো প্রয়োগ সম্ভব না হলেও ব্রাজিল, জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি একদিকে যেমন কৃষিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে, অন্যদিকে পতঙ্গবাহিত (যেমন-মশা) রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন Insect Biotechnology গবেষণাগারে SIT নিয়ে গবেষণা চলছে।

বাংলাদেশের প্রথম GM (Genetically Modified) খাদ্য ফসল

জেনেটিক মডিফিকেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের রোগ-বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তাকে GM ফসল বলে। পৃথিবী জুড়ে এখন প্রায় ৩০টি দেশ GM ফসল (Genetically Modified crop) উৎপাদন করছে। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৪, বাংলাদেশে প্রথম একটি GM খাদ্য ফসল (Bt-বেগুন) চাষের জন্য সরকার অনুমোদন দিয়েছে। এর চারটি জাত নির্বাচিত কৃষকের কাছে বিতরণ করা হয়েছে।

Bt-বেগুন কী? *Bacillus thuringiensis* নামক একটি সয়েল ব্যাকটেরিয়া থেকে ক্রিস্টাল প্রোটিন জিন (Cry1Ac) বেগুনের জিনোমে অন্তর্ভুক্ত করে উৎপন্ন বেগুনের নাম দেয়া হয়েছে Bt-বেগুন।

Scanned by CamScanner

সাধারণ বেগুন ও Bt-বেগুনের মধ্যে পার্থক্য হলো এক প্রকার পোকা সাধারণ বেগুন গাছের কচিডগা ও ফল ছিদ্র করে নষ্ট করে ফেলে যার ফলে ফলন দারুণভাবে হ্রাস পায়। পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য কৃষককে প্রতি সিজন-এ ৬০-১৮০ বার পোকানাশক ওষুধ স্প্রে করতে হয়। Bt-বেগুনে ঐ পোকার আক্রমণ হবে না, তাই পোকানাশক ওষুধও স্প্রে করতে হবে না।

পোকানাশক স্প্রে করলে কী হয়? বেগুন ক্ষেতে পোকানাশক স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ থেকে গাছ ও ফসল রক্ষা পায়, তবে-

(i) বেগুনের সাথে ওষুধ মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং পরিণামে ক্যান্সার-এর মতো মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়।

(ii) ফসলের জমি থেকে বৃষ্টির পানির সাথে পোকানাশক বিষ নিকটস্থ নদী-নালা-খাল-বিলে জমা হয় এবং জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিশেষ করে মাছের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষাক্ত হয়।

(iv) কৃষকের হাজার টাকার ওষুধ কিনতে হয় এবং বহু কর্মঘন্টা ব্যয় করে ওষুধ স্প্রে করতে হয়।

(v) ওষুধ স্প্রেকারী ব্যক্তিও এক সময় এই বিষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। **এতে কেবলমাত্র ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানি লাভবান হয়, আর সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।**

Bt-বেগুন চাষ করলে কী লাভ হবে?

Bt-বেগুন চাষ করলে কৃষক নিম্নলিখিতভাবে লাভবান হবেন।

(i) পোকানাশক ওষুধ কিনতে হবে না ও স্প্রে করতে হবে না। এতে হাজার হাজার টাকা উৎপাদন খরচ কম হবে।

(ii) আমরা যারা বেগুন খাই তারাও ঐ বিষ দ্বারা বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবো না এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি থেকে বেঁচে থাকবো।

(iii) মাটি ও পরিবেশ বিষমুক্ত থাকবে।

(iv) আশেপাশের জলাশয় বিষমুক্ত থাকবে এবং জলজ পরিবেশের স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

(v) উৎপাদন বাড়বে।

GM-ফসল কি ক্ষতিকর?

পরিবেশবাদীরা বরাবরই এর বিরোধিতা করে আসছে। যদিও তাদের কাছে এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। আমরা জানি প্রতিটি জিন একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করে এবং ঐ প্রোটিনই ঐ জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়। কাজেই Bt-ক্রিস্টাল জিনও একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরি করবে। ঐ প্রোটিন আমাদের দেহে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে কিনা সেটাই প্রধান প্রশ্ন। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, Bt-জিন বিশেষ পোকার জন্য বিষাক্ত হলেও মানুষের জন্য বিষাক্ত নয়। এছাড়া Bt-বেগুন উদ্ভাবনের পর পৃথিবীর উন্নত দেশে ১০টির অধিক গবেষণাগারে মাছ, মুরগি, ছাগল, খরগোশ, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর উপর গবেষণায় কোনো ক্ষতিকর প্রভাব প্রতীয়মান হয়নি। কাজেই আমরা দ্বিধাহীন মনে Bt-বেগুন খেতে পারবো।

২। **চিকিৎসা বিজ্ঞানে :** চিকিৎসা বিজ্ঞানে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই সফলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টিকা, হরমোন, অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন। রোগ শনাক্তকরণেও এখন ব্যবহৃত হচ্ছে জিন প্রযুক্তি। সুস্থ সবল শিশু জন্মদানের ক্ষেত্রেও এ প্রযুক্তি নিয়ে আসছে আশার আলো।

মানুষের দেহের প্রতিটি কোষ ২৫০০০ পর্যন্ত কর্মক্ষম জিন বহন করে (আরো বহু জিন মানবদেহে আছে যাদের কাজ এখনো জানা সম্ভব হয়নি)। এর যেকোনো একটি নির্দিষ্ট জিন-এ ভ্রম (error) দেখা দিলে দেহে রোগ সৃষ্টি হতে পারে। মানুষের এরূপ ৩৫০০টি জেনেটিক ডিসঅর্ডার জানা গেছে। আশা করা হচ্ছে এগুলো রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির মাধ্যমে দূরীভূত করা যাবে।

Scanned by CamScanner

(i) ইনসুলিন (Insulin) : ইনসুলিন হলো এক ধরনের হরমোন যা মানব অগ্ন্যাশয়ে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স এর বিটা কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। ইনসুলিন মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের (Pancreas) বিটা-কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রাকে কমিয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। কোনো কারণে অগ্ন্যাশয় হতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে অথবা কম নিঃসৃত হলে অথবা নিঃসৃত ইনসুলিন অকার্যকর হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, অর্থাৎ ডায়াবেটিস রোগ হয়। এমতাবস্থায় ডায়াবেটিক রোগীকে ইনসুলিন ইনজেকশন নিতে হয়। বাংলাদেশে এ ধরনের রোগীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ, তাই ইনসুলিনের চাহিদাও ব্যাপক।

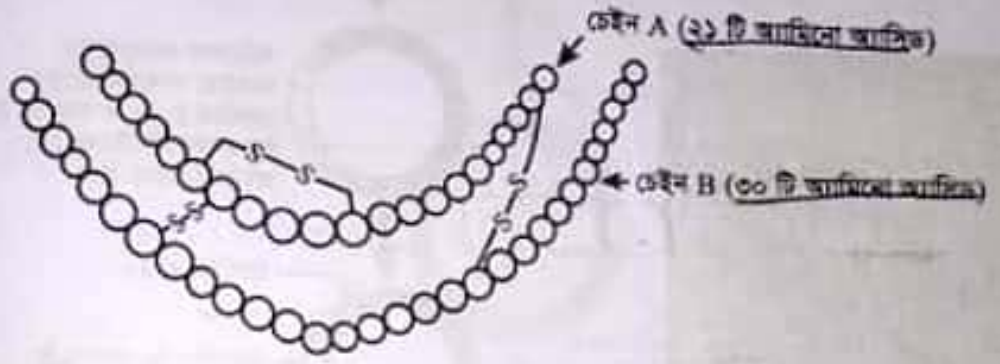

ইনসুলিনের A ও B চেইন। দুটি সিস্টিনের মধ্যে ডাইসালফাইড বন্ড তৈরি হয়

ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার সরল প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন (২১টি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-A এবং ৩০টি অ্যামিনো অ্যাসিড নিয়ে গঠিত চেইন-B) দুটি ডাইসালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে একটি ইনসুলিন অণু গঠন করে। এর রাসায়নিক সংকেত হলো : $C_{254}H_{377}N_{65}O_{75}S_6$, আণবিক ভর ৫৭৩৪ বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন *E. coli*-তে স্থানান্তর করে ব্যাপক হারে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। একটি ব্যাক্টেরিয়াম কোষে প্রায় দশ লক্ষ অণু ইনসুলিন তৈরি হয়ে থাকে।

জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে মানুষের ইনসুলিন উৎপাদন

ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিন প্রয়োজন, কিন্তু প্রকৃতিতে এত ইনসুলিন কোথায়? একসময় গরু বা শূকরের অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন সংগ্রহ করে তা মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতো। কিন্তু গরু বা শূকর থেকে নেয়া ইনসুলিন মানুষের জন্য ততটা উপযোগী নয়। কাজেই জিন প্রকৌশল জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানুষের জিনকে ব্যবহার করে কৃত্রিম উপায়ে ইনসুলিন উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং এক সময় তা সফল হয়। প্রথমেই মানুষের DNA-তে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনের অবস্থান নির্ণয় করা হয়। তা হলো ১১ নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর DNA-এর শীর্ষে। এতে ১৫৩টি নাইট্রোজেন-বেস নিয়ে গঠিত ইনসুলিনের জেনেটিক কোড বিদ্যমান।

জিন প্রকৌশল তথা জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে মানব ইনসুলিন উৎপাদন কৌশল আবিষ্কার করেন আমেরিকার Eli Lily & Company, যা ১৯৮২ সালে প্রথম বাজারজাত করা হয় 'হিউমুলিন' নামে।

ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে :

১। ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন শনাক্তকরণ : মানবদেহে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিনটির অবস্থান বর্তমানে শনাক্তকৃত। ১১নং ক্রোমোসোমের খাটো বাহুর শীর্ষ অংশের DNA-তে এই জিন অবস্থিত। এটি ১৫৩টি নাইট্রোজেন বেস নিয়ে গঠিত।

Scanned by CamScanner

২। **DNA সূত্র থেকে ইনসুলিন জিন অংশ পৃথককরণ :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে মানব DNA থেকে ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন অংশ বিশেষ উপায়ে কেটে পৃথক করা হয়।

৩। **বাহক প্লাসমিড পৃথককরণ :** ইনসুলিন জিনকে বহন করার জন্য *E. coli* ব্যাকটেরিয়াম থেকে বিশেষ কৌশলে প্লাসমিড পৃথক করা হয়।

৪। ***E. coli* প্লাসমিড DNA-এর একাংশ কর্তন :** রেস্ট্রিকশন এনজাইম প্রয়োগ করে ইনসুলিন জিনের সমপরিমাণ প্লাসমিড DNA অংশ কেটে স্থান ফাঁকা করা হয়।

৫। **প্লাসমিড DNA-তে ইনসুলিন জিন স্থাপন :** প্লাসমিড DNA-এর কর্তিত ফাঁকা স্থানে মানুষের ইনসুলিন জিন (DNA অংশ) বসিয়ে দেয়া হয় এবং লাইগেজ এনজাইম প্রয়োগ করে প্লাসমিড DNA এবং মানব DNA সংযুক্ত করে দেয়া হয়। এবার তৈরি হলো রিকম্বিনেন্ট DNA বা রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড।

৬। **রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড একটি *E. coli* ব্যাকটেরিয়ামে প্রবেশ করানো :** এটি করা হয় ট্রান্সফরমেশন প্রক্রিয়ায়। এটি **হিট শক মেথড** অথবা **ইলেক্ট্রিক পালস** মেথডে করা হয়। যে ব্যাকটেরিয়া রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিড বহন করবে তাকে Vector (বাহক) বলা হয়। বাহক অবশ্যই নিজস্ব প্লাসমিড মুক্ত হতে হবে। প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য ভেক্টরকে Competent (উপযুক্ত) হতে হয়। হিট শক মেথড অনুসারে ভেক্টরকে (*E. coli*) প্রথমে $CaCl_2$ দ্রবণে ডুবিয়ে ১৪-১৬ ঘণ্টা বরফে রাখা হয়। এতে *E. coli*-এর কোষ প্রাচীরে Ca লেগে থেকে *E. coli* কোষকে প্লাসমিড গ্রহণ করার জন্য Competent করে থাকে। এরপর *E. coli* কোষ এবং রিকম্বিনেন্ট প্লাসমিডকে একত্রে মিকচার করে একটি পাত্রে আধা ঘণ্টা বরফে, পরে ৪২°C তাপে ৯০ সেকেন্ড এবং পুনরায় ২ মিনিট বরফে রাখলে *E. coli* কোষ শোষণ করে প্লাসমিড দেহাভ্যন্তরে নিয়ে নেয়। এবার *E. coli* কোষ ইনসুলিন জিনসহ **GMO *E. coli***-এ পরিণত হলো।

৭। **ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে GMO *E. coli* সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ :** এবার GMO *E. coli* তথা ট্রান্সজেনিক *E. coli* কে নির্দিষ্ট কালচার মিডিয়াযুক্ত ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফার্মেন্টেশন ট্যাংকে অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ লক্ষ ট্রান্সজেনিক *E. coli* সৃষ্টি হয় এবং সাথে প্রতি কোষে উৎপাদিত ইনসুলিন জমা হয়।

৮। **ইনসুলিন পৃথকীকরণ :** ইনসুলিন তৈরি হয়ে কোষের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। তাই *E. coli* কোষসমূহকে lysis (বিগলিত) করে ইনসুলিন আহরণ করা হয়।

৯। **ইনসুলিন বিশুদ্ধকরণ :** ব্যাকটেরিয়াকে বিগলন করার মাধ্যমে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তাতে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব অনেক প্রোটিনও থাকা স্বাভাবিক। তাই আহরিত ইনসুলিনকে বিশুদ্ধ করা হয়।

বাজারজাতকরণ : উৎপাদন পরবর্তীতে উপযুক্ত এম্পুলে ভরে ইনসুলিন বাজারজাত করা হয় এবং ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পরিমাণে ও সময়ে পেশিতে পুশ করা হয়। দেহে ইনসুলিন রক্তের সাথে প্রবাহিত হয়ে দেহকোষের মেমব্রেনে উপযুক্ত রিসেপ্টিভ সাইট তৈরি করে যার ফলে রক্ত থেকে গ্লুকোজ কোষের ভেতরে প্রবেশ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

কাজ : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি একটি পোস্টার পেপারে অঙ্কন করে ক্লাসে/তোমার পড়ার ঘরে টানিয়ে দাও।

(ii) **ইন্টারফেরনস (Interferons) :** ইন্টারফেরন হলো এক ধরনের উচ্চ আণবিক ওজন সম্পন্ন প্রোটিন যা ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি ও ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়। বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রেরই একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আছে, তেমনই বহিরাগত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, বিষ, অন্য কোনো বস্তু ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিটি মানবদেহে একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকে, এটি দেহের ইমিউন সিস্টেম (immune system)। ইন্টারফেরন হলো প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র (chemical defence) যা দেহের ইমিউন সিস্টেমের অস্ত্র

Scanned by CamScanner

গঠিত। এক কথায়, ইন্টারফেরন হলো প্রতিরক্ষামূলক প্রোটিন (defence protein)। কোনো দেহকোষ বিশেষ ভাইরাস দ্বা সংক্রমিত হলে তার প্রতি সাড়া দিয়ে সংক্রমিত কোষ ইন্টারফেরন নামক রাসায়নিক পদার্থ (গ্লাইকো-প্রোটিন) নিঃসৃ করে। নিঃসৃত ইন্টারফেরন আক্রমণকারী ভাইরাসের প্রোটিন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, ফলে ভাইরাসটি নি সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না, ফলে পরবর্তী কোষগুলোকে আর আক্রমণ করতে পারে না। কাজেই সংক্রমিত কোষ চারপাশের কোষগুলো ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, অধিকন্তু এরা ভাইরাস-প্রতিরোধক্ষম হয়ে ওঠে। কাজে ইন্টারফেরনের কাজ হলো আক্রমণকারী ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়া এবং সুস্থ কোষগুলোকে ভাইরা প্রতিরোধক্ষম করে তোলা ও ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Alick Isaacs & Jea Lindermann ১৯৫৭ সালে ইন্টারফেরন আবিষ্কার করেন।

ইন্টারফেরনের ব্যবহার : ইন্টারফেরন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির হরমোন, এমনকি একই দেহের বিভিন্ন টিস্যু থে বিভিন্ন প্রকার ইন্টারফেরন তৈরি হয়। ভাইরাস আক্রান্ত লিউকোসাইট থেকে এক ধরনের ইন্টারফেরন, ফাইব্রোব্লাস্ট থে থেকে অন্য ধরনের ইন্টারফেরন নিঃসরণ হয়। ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত কোষ কর্তৃক ইন্টারফেরন নিঃসৃত হলেও বর্তমা রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে অধিক পরিমাণে ইন্টারফেরন উৎপন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। ইন্টারফেরন প্রয়োগ ক জটিল হেপাটাইটিস-B, কতক হার্পিস সংক্রমণ, বিভিন্ন ধরনের প্যাপিলোমা (Papilloma) চিকিৎসা করা সম্ভব হয়ে এছাড়া জলাতঙ্ক (rabies) রোগের চিকিৎসায়ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। গবেষকগণ ধারণা করছেন যে ক্যান্সার কোষে বৃদ্ধি রহিত করতে ইন্টারফেরন সফলভাবে ব্যবহার করা যাবে।

ইন্টারফেরন উৎপাদন প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ

১। মানুষের ফাইব্রোব্লাস্ট কোষ থেকে DNA আহরণ করা হয় এবং তা থেকে ইন্টারফেরন (ইন্টারফেরন-বিটা) কোড বহনকারী জিন পৃথক করা হয়।

২। একটি উপযুক্ত প্লাসমিডকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়।

৩। এবার ইন্টারফেরন জিন অংশকে DNA লাইগেজ এনজাইম দিয়ে প্লাসমিডের কাটা (ফাঁকা) অংশে সংযুক্ত ক হয়। অর্থাৎ একটি রিকম্বিনেন্ট DNA অণু তৈরি করা হয়।

৪। ইন্টারফেরন জিনসহ রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো হয়।

৫। এবার আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA বিশিষ্ট *E. coli*-এর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি করা হয়। *E. coli* কর্তৃক উৎপাদিত ইন্টারফেরন আবাদ মাধ্যমে নিঃসৃত হয়।

৬। আবাদ মাধ্যম থেকে ইন্টারফেরন পৃথক করে বিশুদ্ধ করা হয়।

৭। বিশুদ্ধকৃত ইন্টারফেরন বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। এরূপ একটি ইন্টারফেরনে বাণিজ্যিক নাম Betaferon.

(iii) টিস্যু প্লাসমিনোজেন অ্যাকটিভেটর (Tissue Plasminogen Activetor = TPA) : মানুষের রক্তনালীতে রক্ত জমাট বেঁধে স্ট্রোক করতে পারে অথবা হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। সাথে সাথে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে। ১৯৭০ সালে প্রথম ব্যাকটেরিয়া কোষ থেকে Streptokinase এনজাইম পাওয়া গেল যা দিয়ে জমাট বাঁধা রক্ত গলিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু এ প্রোটিনটি মানুষের নিজস্ব প্রোটিন নয় বিধায় দেহে বহু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

মানুষের রক্তে এমনিতেই প্লাজমিন এনজাইম (Plasmin enzyme) থাকে যা Plasminogen অবস্থায় বিরাজ করে। প্লাজমিনোজেন নিষ্ক্রিয় (inactive) অবস্থায় থাকে। প্লাজমিনোজেনকে কর্মক্ষম অবস্থায় আনতে হলে TPA-এর দরকার হয়।

TPA তৈরি প্রক্রিয়া :

(i) মানুষের কোষ থেকে TPA জিন এর mRNA পৃথক করা হয়েছে।

(ii) mRNA থেকে cDNA তৈরি করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

(iii) cDNA-কে উপযুক্ত প্লাসমিডে অন্তর্ভুক্ত করে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করা হয়েছে।

(iv) রিকম্বিনেন্ট DNA-কে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রবেশ করানো হয়েছে।

(v) আবাদ মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli*-কে আবাদ করে হাজার হাজার কপি (ক্লোনিং) করা হয়েছে।

(vi) *E. coli* থেকে TPA প্রোটিন পৃথক করে ওষুধ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে।

(vii) হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক-এর রোগীর রক্ত নালিতে TPA ইনজেক্ট করলে রক্তের ব্লক বিগলিত হয়ে যায় এবং রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।

(viii) TPA নিঃসরণকারী জিন মানুষের দেহ থেকে নেয়া বলে এর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

(iv) ইরিথ্রোপোইটিন (Erythropoietin-EPO) তৈরি : আমাদের কিডনি ইরিথ্রোপোইটিন (EPO) নামক একটি হরমোন তৈরি করে যা রক্ত প্রবাহের সাথে বোনম্যারো (bone marrow)-তে প্রবেশ করে। EPO, বোনম্যারো কোষকে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে এবং প্রচুর RBC (লোহিত রক্ত কণিকা) উৎপন্ন হয়। যাদের কিডনি বিকল হয়ে যায় বা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে তাদের নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হয়। ডায়ালাইসিস-এর সময় এই হরমোনও (EPO) রক্ত থেকে বের হয়ে যায়, ফলে রোগীর দেহে RBC একেবারেই কমে যায়, রোগী তাই রক্তশূন্যতায় ভোগে।

EPO তৈরি প্রক্রিয়া : নিম্নে EPO তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো :

(i) মানুষের দেহ থেকে EPO জিন পৃথক করা হয়েছে। (ii) পরে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে এবং লাইগেজ এনজাইম দিয়ে সংযুক্ত করে এই জিনকে উপযুক্ত বাহকে (প্লাসমিড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (iii) পরে এই রিকম্বিনেন্ট DNA-কে অপর ব্যাকটেরিয়াতে (*E. coli*) প্রবেশ করানো হয়েছে। (iv) রিকম্বিনেন্ট DNA সহ *E. coli* ব্যাকটেরিয়াকে আবাদ মাধ্যমে আবাদ করে হাজার হাজার কপি করা হয়েছে। (v) *E. coli* থেকে EPO প্রোটিন নিষ্কাশন করে ওষুধ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়েছে। বর্তমানে হাজার হাজার কিডনি রোগীকে রক্তশূন্যতা দূরীকরণার্থে *E. coli*-তে উৎপন্ন EPO ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে।

(v) জিন থেরাপি (Gene therapy) : কোনো নির্দিষ্ট রোগ উৎপাদনের জন্য দায়ী ত্রুটিপূর্ণ জিনকে সঠিক করার (to correct) পদ্ধতি হলো জিন থেরাপি। ত্রুটিপূর্ণ জিনটিকে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কেটে সরিয়ে নিয়ে ঐ জায়গায় corrected জিন প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। দু'টি উপায়ে এটি করা হয়ে থাকে, যথা : (i) গবেষণাগারে corrected জিন সম্বলিত কোষকে জন্মিয়ে রোগীর দেহে ইনজেক্ট করা হয়, অথবা (ii) একটি বাহক (vector), সাধারণত একটি ভাইরাসকে corrected জিনসহ মানুষের DNA বহন করার জন্য পরিবর্তন করা হয় এবং তাকে সরাসরি মানুষের টার্গেট কোষে প্রবেশ করানো হয়। টার্গেট কোষে তখন corrected DNA সংযুক্ত হয়ে যায় এবং রোগ মুক্ত করে।

৩। মলিকুলার ফার্মিং : ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদেরকে বায়ো-রিঅ্যাক্টর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ধরনের প্রাণী থেকে প্রাপ্ত দুধ, রক্ত ও মলমূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধ আহরণ করা হয়ে থাকে।

৪। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (Environmental Management) : যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশকে উন্নত করা যায়, পরিবেশ দূষণকারী উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ বা পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায় তাকে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বলে। জীবজগতের বসবাসের জন্য চাই সুন্দর পরিবেশ। সুন্দর পরিবেশ ঠিক রাখা ও তৈরি করার জন্য চাই সুন্দর ও বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার কতিপয় ক্ষেত্রে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

(ক) কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য : কলকারখানা ও খনি থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ঘটায়। কলকারখানা থেকে নির্গত সায়ানাইড, লেড, মারকারি, কপার এবং জিঙ্ক অত্যন্ত বিষাক্ত এবং দীর্ঘস্থায়ী দূষিত পদার্থ। কলকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্যে বিভিন্ন অণুজীব জন্মায় এবং বর্জ্য পদার্থকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে। ফ্রান্স, জাপান, তাইওয়ান এবং ভারতে পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় যা

Scanned by CamScanner

single cell protein হিসেবে পশু ও মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অণুজীবের সহায়তায় দুধের (dairy) কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য (whey) থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা হয়। কাগজ ও কাগজের মণ্ড (pulp এবং paper industry) থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থে *Torula* নামক ঈস্ট জন্মায় যার মধ্যে প্রচুর আমিষ থাকে। *Saccharomyces cerevisiae* এবং *Torula utilis* বর্জ্য পদার্থের মধ্যে জন্মায়। এদের থেকে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।

কাগজ শিল্পের কাঁচামাল ব্লিচ করতে ক্লোরিন ব্যবহৃত হয়। এ ক্লোরিনজনিত দূষণ থেকে পরিবেশকে বিভিন্ন ছত্রাক ব্যবহার করে সহজেই মুক্ত করা যায়। পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পের সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্যকেও বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের মাধ্যমে উপকারী সরল দ্রব্যে রূপান্তর করা যায়, ফলে একদিকে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয় এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় লাভজনক দ্রব্য পাওয়া যায়, যেমন- বিভিন্ন জৈব অ্যাসিড (অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড ইত্যাদি), ইথানল, প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যাসিটোন, গ্লিসারিন, বুটানল ইত্যাদি।

(খ) সমুদ্রে তেল নির্গমন : দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নানা উপায়ে সমুদ্রে তেল-এর মাধ্যমে দূষণ (pollution) ঘটতে পারে এবং তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। তেল পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানি অপেক্ষা হালকা বলে তা পানির উপর ভাসতে থাকে এবং চকচকে একটি স্তরের সৃষ্টি করে। তেলের এ স্তর সমুদ্রে বসবাসকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু সমুদ্রে যে সমস্ত হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব বাস করে তারা অদ্রবণীয় তেল দানার সাথে লেগে থেকে সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে এবং অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তেলকে ভেঙে সরল উপাদানে পরিণত করে এবং তেল দূষণ থেকে মুক্ত করে। তবে কোনো উপায়ে তেল সমুদ্রের তলায় চলে আসলে বছরের পর বছর তা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কারণ অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এ অণুজীবগুলো কাজ করে না। *Pseudomonas, Nocardia, Mycobacteria,* বিশেষ ধরনের ঈস্ট ও মোল্ড জাতীয় ছত্রাক হাইড্রোকার্বন অক্সিডাইজিং অণুজীব হিসেবে কাজ করে থাকে।

জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন প্রকরণের *Pseudomonas* ব্যাকটেরিয়া উদ্ভাবন করা হয়েছে যা তেল ও হাইড্রোকার্বনকে অতি দ্রুত নষ্ট করে দিয়ে পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করতে পারে।

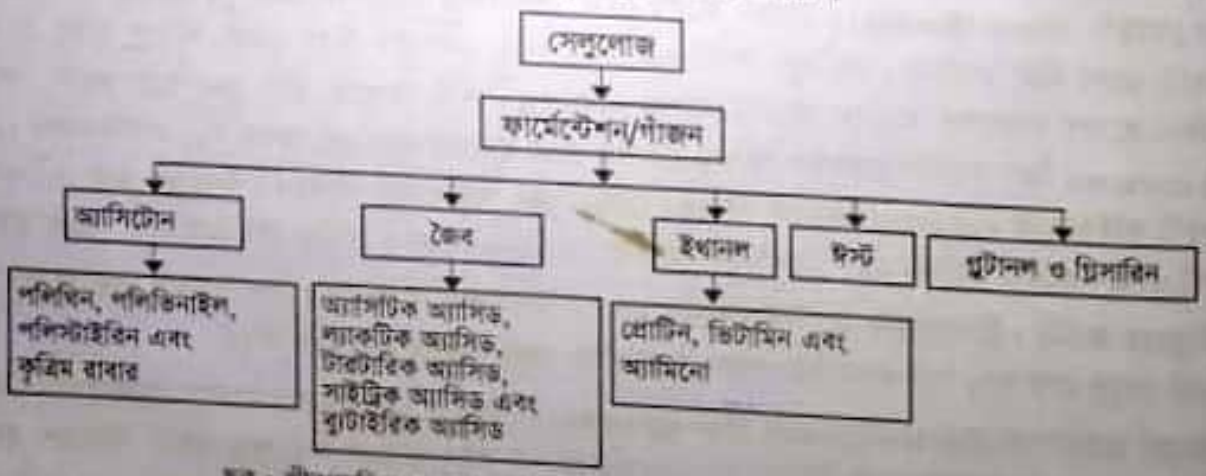

ছক : জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেলুলোজ জাতীয় বর্জ্য থেকে বিভিন্ন পদার্থের উৎপাদন।

(গ) পয়ঃবর্জ্য বা সিউয়েজ আস্তীকরণ : ঘরবাড়ি, মহল্লা বা কুচিখানার হতে নির্গত মলমূত্র ও জঞ্জালকে সিউয়েজ (sewage) বা নর্দমার ময়লা বলে। অনেক সময় ঝড়বৃষ্টির পরিত্যক্ত পানিও ভূগর্ভস্থ নর্দমা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিউয়েজে পরিণত হয়। রোগ উৎপাদনকারী পরজীবীসহ জৈব ও অজৈব পদার্থ নিয়ে সিউয়েজ গঠিত। অজৈব পদার্থ যেমন- কাদা, বালি এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমে আলাদা করা হয়। জৈব পদার্থ পানি দূষণের অন্যতম কারণ। তাই সিউয়েজ পানি যাতে খাবার বা ব্যবহার্য পানির সাথে মিশতে না পারে সেজন্য উন্নত দেশে জৈবিক উপায়ে পরিশোধন করা হয়। বায়বীয় বা অবায়বীয় ব্যাকটেরিয়াসহ শৈবাল, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

Scanned by CamScanner

এরা জৈব পদার্থকে ভেঙে CO_2 ও CH_4 -এ পরিণত করে। CH_4 জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং প্রথমটি গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে ছাড়া পায়। জৈবিক বিক্রিয়ার পর মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ করে পানি নদী বা সাগরে ফেলা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশে সিউয়েজ বিশুদ্ধকরণ করা হয় না বললেই চলে।

বর্তমানে সিউয়েজ আস্তীকরণের সুবিধার জন্য কিছু নির্বাচিত অণুজীবের স্টার্টার কালচার তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া সিউয়েজ আস্তীকরণের কিছু প্লান্টও উদ্ভাবিত হয়েছে। এসবের উদ্ভাবনের ফলে সিউয়েজ আস্তীকরণ আরও সহজসাধ্য হয়েছে।

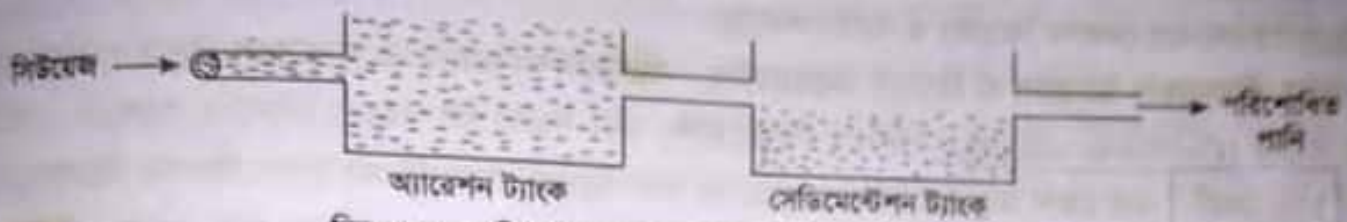

চিত্র ১১.৮ : এক্টিভেটেড স্ল্যাজ পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন।

বর্তমানে সারা বিশ্বে **একটিভেটেড স্ল্যাজ** (activated sludge) পদ্ধতিতে সিউয়েজ পরিশোধন করে পরিশোধিত পানি নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। এটি একটি সহজ জীবজ পদ্ধতি, ফলে পরিবেশ দূষণ মুক্ত থাকে। এ পদ্ধতিতে **অ্যারেশন ট্যাংক** ও **সেডিমেন্টেশন ট্যাংক** নামক দুটি ট্যাংক ব্যবহার করা হয়। প্রথম ট্যাংকে বিভিন্ন অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) মজুত থাকে যারা জৈব বস্তুকে ভেঙ্গে CO_2 ও পানিতে পরিণত করে। দ্বিতীয় ট্যাংকে পানিকে স্থিতিশীল রাখা হয় ফলে নিচে তলানি জমা হয় এবং উপরে পরিশোধিত পানি থাকে, যা নদী বা হ্রদে ছাড়া হয়। তলানি সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ কাজে ব্যবহৃত একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাকটেরিয়াম হলো ***Zooglea ramigera.***

জিনোম সিকোয়েন্সিং
(Genome sequencing)

জিনোম সিকোয়েন্সিং আধুনিক জীবপ্রযুক্তির এক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। প্রতিটি জীবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। সাধারণত ক্রোমোসোমগুলো বিভিন্ন গঠন বা ধরনের হয়। কোনো একটি প্রজাতির একটি নিউক্লিয়াসে সবগুলো ক্রোমোসোমের একটি সেটকে বলা হয় জিনোম (genome)। হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে একটি জিনোম থাকে, আর ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসে দুটি জিনোম থাকে। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে। প্রতি জোড়ার একটি করে ২৩টি ক্রোমোসোম মিলিতভাবে গঠন করে মানুষের জিনোম। কাজেই মানুষের দেহকোষে এক জোড়া জিনোম আছে।

ক্রোমোসোমের মূল উপাদান DNA এবং DNA-এর অংশবিশেষই জিন হিসেবে কাজ করে। কাজেই বলা যায়, একটি জীবে এক সেট ক্রোমোসোমে অবস্থিত সকল জিনসহ পূর্ণাঙ্গ DNA-ই জিনোম। সহজভাবে একটি জীবকোষে অবস্থিত জিন সমষ্টিকে একত্রে জিনোম বলা হয়। একটি জীবের জিনোমকে ঐ জীবের 'মাস্টার ব্লুপ্রিন্ট' বলা হয়।

আমরা জানি অসংখ্য নিউক্লিয়োটাইড বিভিন্ন বিন্যাসে সজ্জিত হয়ে DNA অণু গঠন করে। এক অণু ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার, এক অণু নাইট্রোজেন বেস (অ্যাডিনিন = A, গুয়ানিন = G, থাইমিন = T এবং সাইটোসিন = C) এবং এক অণু ফসফেট সংযুক্ত হয়ে এক একটি নিউক্লিয়োটাইড গঠিত হয়। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে ATGC বেসগুলো কোন অনুক্রমে (কোনটির পর কোনটি) সজ্জিত থাকে তা হলো জিনোম সিকোয়েন্স, আর এই সিকোয়েন্সটি (সাজান পদ্ধতিটি) উদঘাটন করাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং।

জিনোম সিকোয়েন্সিং কাজটি উন্নত প্রযুক্তি ও বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি নির্ভর। লম্বা DNA অণুটি একসাথে সিকোয়েন্সিং করা সম্ভব হয় না, তাই DNA অণুকে উপযুক্ত দূরত্বে কেটে নেয়া হয় এবং খণ্ডগুলোর সিকোয়েন্সিং করে একসাথে মিলিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সিকোয়েন্সিং উপস্থাপন করা হয়। তবে প্রথম দিকে প্রক্রিয়াটি যত ব্যয়বহুল ছিল বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যয় বহুলাংশে কমে এসেছে।

Scanned by CamScanner

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রবর্তক হলেন Dr. F. Sanger, যিনি পরবর্তীতে এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। প্রক্রিয়াটি এরূপ : (i) প্রাথমিকভাবে নির্দিষ্ট DNA অণুকে রিএজেন্ট সমৃদ্ধ চারটি টেস্টটিউবে ভাগ করে দেয়া হয়, যেখানে বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি DNA খণ্ডের A.T.G.C রেসিডিউ শনাক্ত করবে। (ii) জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে পাশাপাশি চারটি বিক্রিয়ার প্রতিটিকে পৃথক করা হয় এবং রেডিওঅ্যাক্টিভ ব্যান্ড-এর স্থান ও পরিমাণ (size) থেকে সিকোয়েন্স নির্ণয় করা হয়। (iii) কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত X-ray স্ক্যানার ব্যবহার করে ইলেক্ট্রোফোরেসিস-এর রেজাল্ট বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়।

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন বা জিনোম সিকোয়েন্সিং : বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম ও তাঁর সহযোগীরা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের দেশি তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) জিনোম সিকোয়েন্সিং তথা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছেন। পাটের ১২০ কোটি পেয়ার এরা কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা জিনোম সিকোয়েন্সিং জানার ফলে এখন উদ্ভাবন করা সম্ভব হবে মিহি আঁশের পাট, শীতকালীন পাট, সহজে পচনযোগ্য পাট, পোকা প্রতিরোধক পাট, ওষুধী পাট, তুলার মতো শক্ত আঁশের পাট ইত্যাদি। কিছুদিন আগে ড. মাকসুদুল আলম মৃত্যুবরণ করেছেন।

ফসলী উদ্ভিদে রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং : মুগডাল বাংলাদেশের একটি অন্যতম ডাল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ। কিন্তু হলুদ মোজাইক ভাইরাসের আক্রমণে এই ফসলের উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম ও গবেষণা সহযোগী দল বাংলাদেশে মুগের হলুদ রোগ উৎপাদনকারী ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং করেন এবং RNAi পদ্ধতি ব্যবহার করে হলুদ মোজাইক ভাইরাস প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবনের গবেষণা করছেন। তাঁর দল ICGEB-র আর্থিক সহায়তায় টমেটোর পাতা কোঁকড়ানো (Tomato leafcurl) রোগ সৃষ্টিকারী ToLCV ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে ToLCV প্রতিরোধী টমেটো জাত উৎপাদনের লক্ষ্যে অধিকতর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কয়েকটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য

জীবের নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	জিনসংখ্যা	ক্ষারজোড়
E. coli	১	৩২০০	৪.৬ মিলিয়ন
Haemophilus influenzae	১	১৭০০	১.৮ মিলিয়ন
	৩২	৬০০০	১২.১ মিলিয়ন
C÷	১০	২৫০০০	১০০ মিলিয়ন
Arabidopsis thaliana (পুষ্পক উদ্ভিদ)	৪৬	২৫০০০	৩.২ বিলিয়ন
মানুষ		(+ বহু অপ্রকাশিত)	

DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট (DNA finger print) : DNA finger prints বুঝতে হলে প্রথমে finger prints সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন। ফিঙ্গার প্রিন্টস বলতে সাধারণত মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ, দাগ বা চিহ্নকে বোঝায়। দুজন মানুষের আঙুলের ছাপ একই রকম হয় না (ক্লোনিং ও আইডেনটিক্যাল টুইন ব্যতীত)। তাই জমিজমা হস্তান্তর বা রেজিস্ট্রি, কাবিন নামা রেজিস্ট্রি, বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সীম নিবন্ধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফিঙ্গার প্রিন্ট রাখা হয়। দুজন মানুষের ফিঙ্গার প্রিন্টের ভিন্নতা হয় জিন তথা DNA (A.T.G.C) এর ভিন্নতার কারণে। কোনো জীবের DNA-কে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করে জেল ইলেকট্রোফোরোসিস (Gel electrophorosis)-এর মাধ্যমে (উক্ত DNA এর) যে ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা ছাপ পাওয়া যায় তাকে **DNA finger print** বা **DNA profile** বলে। প্রথমে কোনো জীব তথা মানুষের সম্পূর্ণ DNA সংগ্রহ করে রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কর্তন করা হয় এবং পরবর্তীতে জেল ইলেকট্রোফোরেসিস এর মাধ্যমে জেল স্তরের উপর চালনা করা হয়। ফলে সেখানে DNA খণ্ডগুলো ক্রমান্বয়ে বড় থেকে ছোট হিসেবে কতগুলো

মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট

Scanned by CamScanner

সারিবদ্ধ ব্যান্ড হিসেবে জমা হবে। বিশেষ ফটোগ্রাফিক পদ্ধতি দ্বারা ব্যান্ডগুলোর প্রকৃতি ও পারস্পরিক অবস্থান জানা যায়। প্রত্যেক জীব তথা মানুষের DNA খণ্ডগুলোর এমন ফটোগ্রাফিক বিন্যাস বা চিত্রকে DNA finger print বা DNA profile বলে।

জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর প্রয়োগ (Application of genome sequencing)

কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির জিনোম সিকোয়েন্সিং-এর মাধ্যমে জানা যায় ঐ প্রজাতির DNA অণুতে অবস্থিত ATGC গুলো কোনটার পর কোনটার অবস্থান অর্থাৎ এদের অনুক্রম। DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে সব অংশে ATGC একই অনুক্রমে অবস্থান করে না, কখনো কখনো একই সাথে পরপর একাধিক A বা একাধিক T থাকতে পারে।

কোনো জীবের জীবনরহস্য জানার প্রথম ধাপ হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং। জিনোম সিকোয়েন্সিং জানলেই জীবের সমস্ত জেনেটিক তথ্য জানা যায় না। সিকোয়েন্সিং এর পর জানা সহজ হয় কোথায় কোন জিনের অবস্থান, জিনের গঠন, জিনের পরিধি এবং কোন জিনের কি কাজ। কোনো জিনের অবস্থান, গঠন, পরিধি ও কাজ জানতে পারলেই ঐ জিনটিকে ব্যবহার করা যায়।

DNA ফরেনসিক্স (DNA Forensics)

(১) **অপরাধী শনাক্তকরণে** : ভিক্টিম বা অপরাধ সংঘটিত হবার স্থান থেকে আলামত সংগ্রহ করে জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। এর পর সন্দেহভাজন তালিকা ধরে তাদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা হয়। যার জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে আলামত থেকে নেয়া সিকোয়েন্সিং এর মিল হবে সেই প্রকৃত অপরাধী। অজ্ঞাত বা খুন হওয়া ব্যক্তির পরিচয় জানতে DNA সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে মৃত অজ্ঞাত জঙ্গীর DNA সিকোয়েন্সিং করে তার পরিচয় নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

(২) **পিতৃত্ব নির্ধারণে** : অনেক সময় সন্তানের পিতৃত্ব নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং এর সাথে পিতৃত্ব দাবিকৃত ব্যক্তিদের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিলিয়ে দেখা হয়। যার জিনোমের সাথে সন্তানের জিনোম সিকোয়েন্সিং মিল সম্পন্ন হবে, তিনিই হবেন সন্তানের প্রকৃত পিতা।

(৩) **স্বজন নির্ধারণে** : সাভারে রানা প্লাজার মর্মান্তিক ঘটনায় পরিচয়হীন শ্রমিকদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে তার সাথে তার দাবিকৃত আত্মীয়দের জিনোম সিকোয়েন্সিং করে মিল পাওয়ার পর লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণের টাকাও দেয়া হয়েছে।

(৪) **শ্রেণিবিন্যাসে স্তর নির্ধারণ** : জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানা হলো আর্কিব্যাক্টেরিয়া, ব্যাক্টেরিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অন্যান্য জীবগোষ্ঠী থেকেও পৃথক, কারণ ১৭৩৮টি জিনের অর্ধেকেরও বেশি জিন অন্যান্য সকল জীবগোষ্ঠী থেকে পৃথক। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়াকে পৃথক অধিরাজ্য (Domain) করা হয়েছে।

(৫) **শ্রেণিবিন্যাস প্রক্রিয়ায় বৈশিষ্ট্যের মিল নির্ধারণে** : আর্কিব্যাক্টেরিয়ার rRNA এর বেস সিকোয়েন্স ব্যাক্টেরিয়ার সাথে মিল সম্পন্ন। তাই আর্কিব্যাক্টেরিয়া ও ব্যাক্টেরিয়া ঘনিষ্ঠতম।

জিনোম সিকোয়েন্সিং এর প্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

১। যে কোনো প্রকৃতির জীব থেকে বিশেষ কোনো জিনকে শনাক্ত করা এবং পরবর্তীতে পৃথক করা; যেমন– মানুষের ইনসুলিন উৎপাদনকারী জিন। এটি ১১ নং ক্রোমোসোমের ছোট বাহুর DNA-এর শীর্ষে অবস্থিত। (চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

২। উদ্ভিদের রোগপ্রতিরোধ, কীটপতঙ্গ প্রতিরোধী বা প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী জিন অনুসন্ধান করা; যেমন– Bt toxin জিন Cry1AC এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জিন PDH 45 (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)।

৩। উদ্ভিদের মান উন্নয়নের জন্য উন্নত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিন অনুসন্ধান এবং জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে তাকে সফলভাবে ব্যবহার করা; যেমন– গোল্ডেন রাইস এর বিটা-ক্যারোটিন জিন। (কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ)

Scanned by CamScanner

৪। জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য উদ্ভিদ বা অণুজীবের মৌলিক গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ; যেমন– ধান, পাট, দুধ ইত্যাদি ফসলের জিনোম সিকোয়েন্সিং তথ্য অন্যান্য মৌলিক গবেষণায় প্রয়োগ।

৫। গবাদি পশুর মাংস, দুধের পুষ্টি গুণাগুণ ও পরিমাণ বৃদ্ধিতে জিনোম সিকোয়েন্সিং পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৬। মানব জিনোম সিকোয়েন্সিং দ্বারা মানব জিনোমের অনেক তথ্যই এখন উন্মোচিত হয়েছে, ফলে এই তথ্যসমূহ চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ অনেক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে; যেমন– ইনসুলিন জিন–এর প্রয়োগ।

৭। যে কোনো জীবে জিনের প্রকাশ (expression of gene) কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং এই তথ্যসমূহ গবেষণা কার্যক্রমে প্রয়োগ।

৮। জীবতথ্য বিদ্যার (Bioinformatics) জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান জিনোম সিকোয়েন্সিং উপাত্ত থেকে গ্রহণ/সংগ্রহ করা।

৯। বন্য জীবজন্তু যেমন-সিংহ, বাঘ, হাতি ইত্যাদির ভালো ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে প্রজননের ক্ষেত্রে DNA সিকোয়েন্সিং কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১০। এছাড়া জৈব জ্বালানী উদ্ভাবন, ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ, ইন্টারফেরন উৎপাদন ও ক্যান্সার গবেষণায় জিনোম সিকোয়েন্সিং সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

কাজ : জীবপ্রযুক্তির সাফল্যজনক প্রয়োগসমূহ নিয়ে একটি চার্ট তৈরি কর।

জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগে জীবনিরাপত্তা (Biosafety) বিধানসমূহ

সৃষ্টিকর্তা মানুষের কল্যাণের জন্যই অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক ভারসাম্য অবস্থা। তাছাড়া হাজার হাজার বছরের ব্যবহারের মাধ্যমে জানা হয়েছে কোনটি মানুষের জন্য ক্ষতিকারক, আর কোনটি ক্ষতিকারক নয়। এর পরও কোনো ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশত কোনো প্রাকৃতিক বস্তু গ্রহণ বা ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার জন্য অন্য কাউকে অভিযুক্ত করার উপায় নেই।

জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে উদ্ভাবন করা হচ্ছে GMO (Genetically Modified Organism)। GMO ব্যবহার করার পূর্বে জেনে নিতে হবে এটি মানুষের কোনো ক্ষতির কারণ হয় কি না, বিশেষ করে যেগুলো মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য ও ওষুধরূপে ব্যবহার করা হবে। যেমন Bt. cotton নামক পোকা আক্রমণরোধী তুলা একটি GMO উদ্ভিদ। তুলা থেকে সুতা, কাপড় ইত্যাদি তৈরি করা হবে যা মানুষের সরাসরি কোনো ক্ষতির কারণ হবে না কিন্তু Bt. Brinjal নামক পোকা আক্রমণরোধী GMO বেগুন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি চাষের জন্য কৃষকের কাছে দেয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে এই বেগুন খেলে মানুষের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় কিনা। পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত হতে হবে যে এই Bt বেগুন মানুষের ইমিউন সিস্টেমের বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতি করবে না।

জীবপ্রযুক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত GMO সমূহের উপর গবেষণা, ব্যবহার এবং প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি সম্বলিত নির্দেশনাকে Biosafety Guidelines বলে। এই নির্দেশিকায় GMO উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করার নীতিমালা ছাড়াও, GMO নিয়ে মাঠ পরীক্ষণ, নিরাপদ স্থানান্তর, আমদানি এবং এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলি এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ বিস্তারিত উল্লেখ করা আছে। এই নির্দেশিকার মুখ্য বিষয়বস্তু হলো GMO ব্যবহারের পূর্বে জীববৈচিত্র্য, প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের উপর সম্ভাব্য সমস্ত ঝুঁকি পরিহার, নিরূপণ এবং তাকে মোকাবিলা করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে পরিচালিত করা।

এই Biosafety Guidelines এর আওতায় বাংলাদেশে একটি জাতীয় জীবনিরাপত্তা কমিটি (National Committee on Biosafety) ও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক জীবনিরাপত্তা কমিটি (Institutional Biosafety Committee) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও জীবনিরাপত্তা কোর কমিটি (Biosafety Core Committee), মাঠ পর্যায়ে জীবনিরাপত্তা কমিটি (Field Level Biosafety Committee) এবং জীব নিরাপত্তা অফিসার (Biological Safety Officer) গঠন করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

Biosafety Guidelines এর আওতাভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১। জীবনিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

২। GMO প্রয়োগের/ ব্যবহারের ফলে সম্ভাব্য সব ধরনের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।

৩। জীববৈচিত্র্য প্রাণী ও মানব স্বাস্থ্যের উপর GMO-এর ক্ষতিকারক দিক নির্ণয় করা এবং তার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

৪। GMO ক্ষতিকারক নয় প্রমাণিত হলে তবেই প্রবর্তন করা।

সার-সংক্ষেপ

টিস্যু কালচার : গবেষণাগারে কৃত্রিম পুষ্টি মাধ্যমে কোনো বিভাজনক্ষম টিস্যুর সংখ্যাবৃদ্ধিই টিস্যু কালচার। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে অল্প সময়ে হাজার হাজার চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপন্ন চারাগুলো একই বয়সের হয় এবং গুণগত মান বজায় থাকে, ফলে ফলন বাড়ে। একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাইরাসমুক্ত বীজ তৈরি করা হয়, ফলে ফসল ভাইরাস আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে এবং ফলন হ্রাস পায় না, কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : কোনো জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত কোনো জিন পৃথক করে নিয়ে অন্য কোনো কাঙ্ক্ষিত জীবকোষে প্রতিস্থাপন করাই হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল। এতে দুটি পৃথক DNA-এর অংশের সমন্বয়ে একটি নতুন প্রকৃতির DNA তৈরি হয়, যাকে বলা হয় রিকম্বিনেন্ট DNA। রিকম্বিনেন্ট DNA দিয়ে তৈরি নতুন বৈশিষ্ট্যের জীবকে বলা হয় GMO (genetically modified organism)। বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল প্রয়োগ করে পতঙ্গবিরোধী তুলা, ভাইরাস বিরোধী পেঁপে, সুপার রাইস, ইনসুলিন প্রভৃতি উৎপাদন করা হচ্ছে।

প্লাসমিড : বিভিন্ন অণুজীবে, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া কোষে তাদের মূল ক্রোমোসোম ছাড়াও এক বা একাধিক বৃত্তাকার DNA থাকে। ক্রোমোসোম বহির্ভূত এসব বৃত্তাকার DNA-কে বলা হয় প্লাসমিড। *E. coli* ব্যাকটেরিয়া কোষে সর্বপ্রথম প্লাসমিডের সন্ধান পান Laderberg ১৯৫২ সালে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্লাসমিড অত্যন্ত আবশ্যকীয় উপাদান। প্লাসমিড বিভিন্ন রকম হতে পারে।

ইনসুলিন : ইনসুলিন একটি হরমোন যা অগ্ন্যাশয়ের বিটা-কোষ হতে নিঃসৃত হয় এবং রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজের উচ্চমাত্রা থেকে স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসে। দেহে ইনসুলিনের অভাব হলে ডায়াবেটিস রোগ হয়। ইনসুলিন ৫১টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রাকার প্রোটিন। দুটি পলিপেপটাইড চেইন দুটি ডাই-সালফাইড বন্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে ইনসুলিন গঠন করে। বর্তমানে মানুষের ইনসুলিন নিঃসরণকারী জিনকে *E. coli* ব্যাকটেরিয়াতে স্থানান্তর করে জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে। ডায়াবেটিক রোগ চিকিৎসার প্রধান হাতিয়ার হলো ইনসুলিন।

জিনোম সিকোয়েন্সিং : কোনো জীবের জিনোমস্থ DNA অণুর অনুদৈর্ঘ্যে নিউক্লিওটাইডসমূহ (ATGC) কোন অনুক্রমে সজ্জিত আছে তা জানাই হলো জিনোম সিকোয়েন্সিং বা DNA সিকোয়েন্সিং। কোনো জীবের জিনোম সিকোয়েন্সিং সম্পন্ন হলে তার বিভিন্ন জিনের অবস্থান ও কার্যকারিতা জানা সহজ হয়। জিনের অবস্থান ও কাজ জানা গেলে তার ত্রুটি-বিচ্যুতি অপসারণ করা সম্ভব হয়। GMO=Genetically Modified Organism; LMO = Living Modified Organism।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। DNA-কে খণ্ডিত করে—
(ক) লাইগেজ এনজাইম (খ) রেস্ট্রিকশন এনজাইম (গ) প্রোটিয়েজ এনজাইম (ঘ) অ্যামাইলেজ এনজাইম

২। রিকম্বিনেন্ট DNA প্রস্তুত করার ধাপ হলো—
(i) কাঙ্ক্ষিত DNA নির্বাচন
(ii) নির্দিষ্ট স্থানে DNA অণুকে ছেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্ট্রিকশন এনজাইম নির্বাচন
(iii) ক্যালাস সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি

Scanned by CamScanner